কৃষ্ণ আফ্রিকার জাগরণ

সুকুমার মিত্র

চলতি দুনিয়া প্রকাশনী
৩ জনক রোড, কলিকাতা-৭০০০২৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৫৯

প্রকাশক : এ. চক্রবর্তী
চলতি দুনিয়া প্রকাশনী
৫ জনক রোড, কলিকাতা-২৯

মুদ্রণ :
সমীক্ষা প্রেস
৪৭, শশীভূষণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
কোয়ালিটি প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড বাইণ্ডার্স
৮৪, রাসবিহারী এভিন্যু, কলিকাতা-৭০০ ০২৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
অজয় গুপ্ত

Krishna Afrikar Jagaran

Sukumar Mitra

উৎসর্গ

কৃষ্ণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের
অমর নেতা আমিলকার কাব্রাল ও অন্যান্য
শত সহস্র শহীদের স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের নিবেদন

সমগ্র কৃষ্ণ আফ্রিকার জাগরণ ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস একটি খণ্ডে প্রকাশ করার বাসনা ছিল কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হলো না। বর্তমান গ্রন্থে কৃষ্ণ আফ্রিকার আদি যুগ থেকে পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির মুক্তিলাভ পর্যন্ত ইতিহাস স্থান পেয়েছে। পরবর্তী আর একটি গ্রন্থে দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও জিমবাবওয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রকাশের ইচ্ছা রইল।

আমার দৃষ্টিহীনতাবশতঃ বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেছে খুব বেশি! এর জন্য পাঠকদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। বেঁচে থাকলে পরবর্তী সংস্করণে সব ভুলত্রুটি দূর করার চেষ্টা করব।

শ্রীমান প্রদ্যোৎ গুহের উদ্যোগে এ শ্রীমান শৈলেন চৌধুরী ও শ্রীমান জগদীশ রায়ের সহায়তায় গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো। এঁরা সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ।

শ্রীমান শ্যামল মৈত্র আমার অস্পষ্ট লেখা উদ্ধারে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন, তার জন্য তিনিও আমার ধন্যবাদের পাত্র।

সুকুমার মিত্র

উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু ছিন্ন করি নিয়ে গেল তোরে
প্রাচীন ধরিত্রীর বক্ষ হতে
রে আফ্রিকা।
রেখে দিল নির্বাসনে মহাঅরণ্যের অন্ধকারে।

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকা সম্পর্কে ভূবিজ্ঞানীদের একটি সিদ্ধান্তকেই তাঁর কবিতায় ব্যক্ত করছেন। কিন্তু "মহা অরণ্যের অন্ধকারে" নির্বাসিত যে আফ্রিকার কথা তিনি বলতে চেয়েছেন তা হলো মূলত কৃষ্ণ আফ্রিকা বা প্রধানত নিগ্রো অধ্যুষিত আফ্রিকা। তাঁর সমগ্র কবিতায় তিনি "মদোদ্ধত" "দস্যুবেশধারী" ইয়োরোপের দ্বারা লাঞ্ছিতা "কালো অবগুণ্ঠনে" ঢাকা নারী রূপে কৃষ্ণ আফ্রিকার ছবিটিকেই তুলে ধরেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশজননীকে যে রূপে দেখেছেন সেই রূপেই আজ কৃষ্ণাঙ্গিনী আফ্রিকা জননীকে দেখে বলা যায়ঃ

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাট নেত্র আগুন বরণ।

আফ্রিকা পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম মহাদেশ। এই মহাদেশকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ঃ আরব আফ্রিকা ও আফ্রিকান আফ্রিকা। আফ্রিকান আফ্রিকার নিগ্রো অধ্যুষিত ভূখণ্ডকে বলা হয় কৃষ্ণ আফ্রিকা। বর্ণের ভিত্তিতে সমগ্র আফ্রিকান আফ্রিকাকে কৃষ্ণ আফ্রিকা বলে গণ্য করা যেতে পারে।

সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে বিস্তৃত আফ্রিকান আফ্রিকার আয়তন দশ কোটি বর্গ মাইল। উত্তর থেকে দক্ষিণে পাঁচ হাজার মাইল এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে দু হাজার মাইল বিস্তৃত এই বিশাল ভূখণ্ডে একাধিক ভারত স্থান পেতে পারে। সে তুলনায় লোকসংখ্যা খুবই কম—২৫ কোটি। । এখন কিছুটা বেড়েছে।

পশ্চিম আফ্রিকায় নিগ্রোদের সংখ্যা ৯ কোটিরও বেশি এবং বান্টু নামে পরিচিত দক্ষিণাংশের নিগ্রোদের (এরা অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে আছে) সংখ্যা প্রায় ৯ কোটি। এ ছাড়া আছে হোটেনটট ও অন্যান্য ছোট ছোট উপজাতি। হোটেনটটদের সংখ্যা

এখন মাত্র ২৪ হাজারে দাঁড়িয়েছে। মোটের উপর কৃষ্ণ আফ্রিকায় নিগ্রোরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সমগ্র আফ্রিকান আফ্রিকাতেও নিগ্রোরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

আফ্রিকান আফ্রিকার মধ্যে আছে নিম্নলিখিত রাষ্ট্র সমূহ :

পশ্চিম আফ্রিকা

	রাষ্ট্র	জনসংখ্যা (হাজার—১৯৭০)	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার
১)	গামবিয়া	৩৬৪	১১,২৯৫
২)	ঘানা	৯,০২৬	২৩৮,৩৫৭
৩)	লাইবেরিয়া	১,১৭১	১১১,৩৬৯
৪)	নাইজেরিয়া	৫৪,০৭৪	৯২৩,৭৬৮
৫)	সিয়েরা লিওন	২,৫,১২ (১৯৬৯)	৭১,৭৪০
৬)	গিনি বিসাউ	৫,৫৬	৩৬,১২৫
৭)	কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জ		১১২,৬২২
৮)	বেনিন	২,৬৮৬	
৯)	গিনি	৩,৯২১	২৪৫,৮৫৭
১০)	আইভরি কোস্ট	৪,৩১০	৩২২,৪৬৩

পশ্চিম আফ্রিকা

	রাষ্ট্র	জনসংখ্যা	আয়তন
১২)	মালি	৪,৪৩৮	১,২৪০,০০০
১২)	নাইজার	৪,০১৬	১,২৬৭,০০০
১৩)	সেনেগাল	৩,৯২৫	১৯৬,১৯২
১৪)	টোগো	১,৮৬২	৫৬,০০০
১৫)	আপার ভোলটা	৫,৩৮৪	২৭৪,২০০
১৬)	সাও তোম ও প্রিন্‌চেপে	৬১	৯৬৪

মধ্য আফ্রিকা

	রাষ্ট্র	জনসংখ্যা	আয়তন
১৭)	মালাউই	৪,৪৩৮	১১৮,৪৮৪
১৮)	জামবিয়া	৪,২৯৫	৭৫২,৬১৪
১৯)	ক্যামেরুন	৫,৮৩৬	৪৭৫,৪৪২
২০)	মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র	১,৬১২	৬২২,৯৮৪
২১)	চাদ	৩,৭০৬	১,২৮৪,০০০
২২)	কংগো (ব্রাজাভিল)	৯৩৬	৩৪২,০০০

	রাষ্ট্র	জনসংখ্যা (হাজার—১৯৭০)	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)
২৩)	গাবোন	৫০০	২৬৭,৬৬৭
২৪)	জাইরে (কংগো-লিওপোল্‌ডভিল)	২১,৫৬৮	২,৩৪৫,৪০৯
২৫)	আংগোলা	৫,৪৩০ (১৯৬৯)	১,২৪৬,৭০০
পূর্ব আফ্রিকা			
২৬)	মোজাম্বিক	৭,৩৬৭ (১৯৬৯)	১৪৬,৭০০
২৭)	বুরুন্‌ডি	৩,৫৪৪	২৭,৮৩৪
২৮)	কেনিয়া	১১,২৪৭	৫৮২,৬৪৫
২৯)	রওন্‌ডা	৩,৫৮৭	২৬,৩৩৮
৩০)	সুদান	১৫,৬৯৫	২,৫০৫,৮১৩
৩১)	তানজানিয়া	১৩,২৭৩	৯৫৫,০৮৭
৩২)	উগান্‌ডা	৯,৮০৬	২৩৬,০৩৬
৩৩)	ইথিওপিয়া	২৫,০৫৬	১,২২১,৯০০
৩৪)	সোমালিয়া	২,৭৮৯	৬৩৭,৬৫৭
৩৫)	জিবুতি	২২,০০০	২৫০,০০০
দক্ষিণ আফ্রিকা			
৩৬)	দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র	২০,১১৩	১,২২১,০৩৭
৩৭)	নামিবিয়া	৬১৫ (১৯৬৯)	৮৪২,২৯২
৩৮)	বোটসোয়ানা	৬৪৮	৬০০,৩৭২
৩৯)	লেসোথো	১,০৪৩	৩০,৩৫৫
৪০)	জিমবাবওয়ে	৫,২৭০	৩৯০,৫৮১
৪১)	সওয়াজিল্যাণ্ড	৪০৮	১৭,৩৬৩

দ্র : প্রধানত : জাতিসংঘের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ইয়ারবুক থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলেও সর্বাধুনিক তথ্যের ভিত্তিতে কিছু যোগ বিয়োগ করা হয়েছে। যেমন, মাউরেটেনিয়া ভৌগলিক দিক থেকে আফ্রিকান আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এটি প্রধানতঃ একটি আরব রাষ্ট্র, কাজেই মাউরেটেনিয়াকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আবার ভৌগলিক দিক থেকে রোডেশিয়া বা জিম্বাবওয়ে মধ্য আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও জিম্বাবওয়েকে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলেই ফেলা হয়। তাই জিম্বাবওয়েকে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

আফ্রিকা—পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম মহাদেশ, মানুষের আদিতম পুরুষ ও আদিপুরুষের লীলানিকেতন, মানবসভ্যতার অন্যতম আদিপীঠ আফ্রিকা আজ এক নতুন গৌরবে মণ্ডিত হয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শেষ অধ্যায় রচিত হচ্ছে আফ্রিকায়। পৃথিবী জুড়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যে প্লাবন দেখা দিয়েছে তা আজ আফ্রিকায় সমাপ্তি লাভ করতে চলেছে। মৃত্যুঞ্জয়ী বীর আফ্রিকানরা উপনিবেশবাদ ও জাতিদ্বেষবাদের সমাধি রচনা করছে। এই বীর যোদ্ধাদের পিছনে আছে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ও মুক্তিকামী সমস্ত মানুষ।

তাই আফ্রিকাকে আজ নতুন করে জানতে চাইছে সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষ। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকেরা যে অসভ্য ও বর্বর আফ্রিকার ছবি তুলে ধরেছিলেন আজ তা বরবাদ হয়ে গেছে। সত্যানুসন্ধী ঐতিহাসিক, নৃবিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানীদের অশেষ পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে অতীতের আফ্রিকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক বিচিত্র ও গৌরবোজ্জ্বল চিত্র পৃথিবীর মানুষের সামনে উদঘাটিত হয়েছে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে মিথ্যা ও অর্ধসত্যের কুহেলিকাজাল। 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' উদভাসিত হয়েছে এক নতুন রূপে।

আফ্রিকা মহাদেশ প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত: উত্তর বা আরব আফ্রিকা এবং কৃষ্ণ আফ্রিকা। উত্তর আফ্রিকার মিশর প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাস সুবিদিত কিন্তু কৃষ্ণ আফ্রিকার ইতিহাস এতদিন অজানা ছিল।

সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের আয়তন ১ কোটি ১৫ লক্ষ বর্গমাইল। আরব আফ্রিকা ও সাহারা মরুভূমি বাদ দিলে বাকি বেশির ভাগটাই পড়ে কৃষ্ণ আফ্রিকার মধ্যে। কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান অধ্যুষিত এই সুবিশাল ভূখণ্ডের প্রাগিতিহাস ও ইতিহাসের কাল ৩০ লক্ষ বছর। এ পর্যন্ত একমাত্র কৃষ্ণ আফ্রিকাতেই মানুষের আদিতম পুরুষ অর্থাৎ বানর ও নর-বানর থেকে মনুষ্য লক্ষণাক্রান্ত জীবের প্রস্তরীভূত দেহাস্থির সন্ধান পাওয়া গেছে যা কমপক্ষে দুই কোটি বছর আগের। আবার এই কৃষ্ণ আফ্রিকাতেই পাওয়া গেছে মানুষের আদিপুরুষের অর্থাৎ প্রকৃত মানুষের সন্ধান যারা প্রথম হাতিয়ার তৈরী ও তা ব্যবহার করতে শিখেছিল। মানুষের এই আদিপুরুষ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করত ৩০ লক্ষ বছর আগে।

এরপর মানুষের ক্রমবিবর্তন ঘটেছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে, নানা স্তর ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে। মানুষ হাতিয়ার উদ্ভাবনে ক্রমেই আরও বেশী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, যৌথ ও পারিবারিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছে, পরস্পরের সঙ্গে মনের কথা বিনিময়ে সফল হয়েছে। এই প্রাগৈতিহাসিক যুগে আফ্রিকার মানুষ অন্যান্য মহাদেশের মানুষের তুলনায় এগিয়েই ছিল, অন্ততপক্ষে কোন মতেই পিছিয়ে ছিল না এ কথা বলা যায়।

তারপর শিকার ও বন্য ফলমূল সংগ্রহের উপর নির্ভর না করে মানুষ যখন মাছ ধরতে, নৌকা গড়তে, আগুন জ্বালাতে শিখে সভ্যতার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেল তখন আফ্রিকায় বসবাস করছিল প্রধানত পরবর্তী কালের মরুঅঞ্চলবাসীদের (বুশম্যান) পূর্বপুরুষরা। এরা ছড়িয়ে ছিল সোমালিয়া থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত ও শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে। বৃক্ষহীন তৃণ-ভূমি অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল নিগ্রো জাতির (Negroid) মানুষ। পরবর্তীকালের বামন (পিগমী), মরু-অঞ্চল-বাসী অথবা নিগ্রো এরা একই নরকুল থেকে উদ্ভূত কিনা এ নিয়ে মতভেদ আছে, যদিও আধুনিক কালে পণ্ডিতেরা নানা তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, বর্তমান কালের মরুঅঞ্চলবাসী বামনরা বিগত দশ হাজার বছরের মধ্যে খর্বকায় হয়ে গেছে এবং সম্ভবত এদের পরস্পরের সঙ্গে এক সময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বামনরা যে দশ হাজার বছর আগে এমন খর্বকায় ছিল না এর প্রমাণ পাওয়া গেছে, কিন্তু কি কারণে তারা এমন খর্বকায় হয়ে গেল তার রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয় নি।

মরুঅঞ্চলবাসী ও বামন ছাড়া আফ্রিকার তৃতীয় আদিবাসী হল নিগ্রোরা। সভ্যতার পথে এরাই সব চেয়ে দ্রুত অগ্রসর হয়। মাছ ধরা এবং চাষ আবাদ শিখে এরা নদী তীরে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে এবং খাদ্যসম্পদের প্রাচুর্য এদের দ্রুত

বংশবৃদ্ধি ঘটায়। শেষ পর্যন্ত নিগ্রোরাই কৃষ্ণ আফ্রিকার সমস্ত অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে।

মরুঅঞ্চলবাসী (বুশম্যান), বামন ও নিগ্রো—আফ্রিকার এই মূল অধিবাসীদের তিনটি জাতিতে (রেস) বিভক্ত করা হলেও খুব সম্ভব মূলে কোন একটি আফ্রিকান নর গোষ্ঠী থেকেই এরা উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হয়।

এ ছাড়া প্রত্ন-প্রস্তর যুগের শেষভাগে প্রায় দশ হাজার বছর আগে এক দল মানুষ আফ্রিকার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে উপস্থিত হয় দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া থেকে। এরা ককেশীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নত এই নরগোষ্ঠীর মানুষেরা পূর্ব আফ্রিকায় যে ক্যাপসীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলে তাই আফ্রিকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। কেনিয়ার রিফ্‌ট উপত্যকার নদীগুলির তীরে এরা স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে এবং কোন কোন পণ্ডিতের মতে এরাই পৃথিবীতে প্রথম মাটির পাত্র তৈরী করে। এর ফলে শস্য ও খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা এবং রাঁধা-বাড়ার ব্যাপারে একটা বড় রকমের অগ্রগতি ঘটে। প্রায় একই সময়ে সুদানের খারটুমে একটি নরগোষ্ঠী অনুরূপ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এরা নিগ্রো বলেই অনুমিত হয়।

ক্রমে যারা ছিল শিকারি ও বন্য ফলমূল সংগ্রহকারী তারা উন্নততর সভ্যতার সংস্পর্শে এসে কৃষিজীবী হয়ে উঠল। আজ থেকে ছয় সাত হাজার বছর আগে আফ্রিকায় যখন কৃষি ও পশু পালনের সূচনা হওয়ার ফলে মানুষ স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে শুরু করল তখন ঐতিহাসিক যুগের মরুচারী, বামন, নিগ্রো ও ককেশীয় 'হামাইট—এই চার নরগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষরাই ছিল কৃষ্ণ আফ্রিকার অধিবাসী।

প্যালেস্টাইন থেকে মিশরে এবং মিশর থেকে আফ্রিকায় চাষ আবাদের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পদ্ধতি অনুসৃত হওয়ার ফলে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল। অবশ্য কৃষ্ণ আফ্রিকায় এই পরিবর্তন ঘটে খুব ধীরে ধীরে, কারণ প্রকৃতি ছিল একান্ত প্রতিকূল। প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়েই কৃষ্ণ আফ্রিকার অধিবাসীরা তাদের কৃষি-ভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তোলে। বহু জায়গাতেই লৌহ যুগ শুরু হওয়ার পর চাষ-আবাদ প্রবর্তন করা সম্ভব হয়।

কালক্রমে কৃষ্ণ আফ্রিকার বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে এবং এই সংমিশ্রণের ফলে আজকের দিনের কৃষ্ণ আফ্রিকার অধিবাসীদের উদ্ভব হয়। এদের বেশীর ভাগই হল বান্টু ভাষাভাষী নিগ্রো। তিন হাজার বছর আগে নিগ্রোদের পূর্বপুরুষরা পশ্চিম আফ্রিকা থেকে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আগে বামন

ও মরুচারী আফ্রিকানদের সংখ্যা অনেক বেশী থাকলেও ক্রমেই তাদের সংখ্যা কমতে থাকে। গ্রীনবার্গের ভাষাসংক্রান্ত ছক অনুসারে ৫০ হাজার বছর আগে যেখানে আফ্রিকায় (প্রত্ন-প্রস্তর যুগে) মাত্র ৪টি ভাষায় কথা বলত মাত্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষ সেখানে দুই হাজার বছর আগে (নব্য-প্রস্তর যুগে) লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ এবং প্রধান ভাষার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭টি। লৌহ যুগে (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) লোক সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১৫ কোটি এবং ভাষার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩০। ঠিক এই রকম ছক অনুসারে লোক ও ভাষার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, কিন্তু এ থেকে মূল প্রবণতা উপলব্ধি করা যায়।

কৃষ্ণ আফ্রিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে মিশরের দান অনেকখানি। মিশরের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও রাজশক্তি যখন হিট্টাইট, আসিরিয় প্রভৃতি জাতির অভ্যুদয়ের ফলে বিপন্ন হল তখন মিশরের রাজারা নীল নদের তীরভূমি ধরে ক্রমেই কৃষ্ণ আফ্রিকার দিকে রাজ্য বিস্তার করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। তাঁরা সুদানে স্থাপন করেন কুশ রাজ্য। এই রাজ্য হাজার বছরেরও বেশী স্থায়ী হয় অর্থাৎ ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে থাকে।

কুশ রাজ্য আরও দক্ষিণে সরে যায় এবং মেরোতে নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়। এই রাজ্যের সীমানা ছিল সম্ভবত খারটুমের কিছুটা দক্ষিণে। এর ফলে কুশ রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে ককেশীয় গোষ্ঠীর মানুষের চাইতে নিগ্রোদের সংখ্যাই বেশী হয়।

নিগ্রোরা ছিল প্রধানত কৃষিজীবী। মিশরের নগর সভ্যতার সঙ্গে এই প্রথম তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটল। প্রকৃতপক্ষে একটি কৃষিজীবী সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল এক নাগরিক সভ্যতা। কৃষ্ণ আফ্রিকার মানুষ যেমন একদিকে এক কেন্দ্রীভূত ও স্বৈরাচারী রাজশক্তির অধীন হয়ে রাষ্ট্র ও প্রশাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল তেমনই চাষ আবাদের উন্নততর পদ্ধতি, গম ও যব চাষ, সোনা, তামা প্রভৃতি ধাতু সংগ্রহ এবং সব চেয়ে বড় কথা হল আকরিক লোহা আহরণ করে লোহা গলিয়ে লোহার জিনিসপত্র তৈরী করতে শিখল। এক কথায় কৃষ্ণ আফ্রিকা লৌহ যুগে উপনীত হল।

ক্রমে আফ্রিকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠল ছোট বড় রাজ্য। এ সব রাজ্যের রাজারা মিশরের ঐতিহ্য অনুসারে দেবতা বলেই গণ্য হতেন। দেবতা মানুষের মত মরতে পারেন না, কাজেই রাজা পীড়িত বা অশক্ত হয়ে পড়লে লোক চক্ষুর অন্তরালে তাঁকে বিষ খাইয়ে মারা হত এবং বিরাট জাঁকজমকের সঙ্গে তাঁর শব সমাহিত করা হত, সঙ্গে দেওয়া হত প্রচুর খাদ্য পানীয় এবং পরলোকে তাঁকে সেবা

করার জন্য পরিচারক পরিচারিকা (রাজার সঙ্গে সমাহিত করার জন্য এদের হত্যা করা হত)। রাজা বিয়ে করতেন তাঁর নিজের ভগ্নীকে এবং রাজমাতা বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী হতেন। একদল আমলার উপর থাকত প্রশাসন ও ব্যবসাবাণিজ্য চালানোর ভার। বহির্বাণিজ্যে রাজারই ছিল একচেটিয়া অধিকার। রপ্তানী করা হত হাতীর দাঁত, পশু চর্ম, সোনা, তামা, লবণ প্রভৃতি।

উল্লিখিত ধরনের যে সব রাজ্য গড়ে উঠেছিল সেই সব রাজ্য ও তাদের সভ্যতা 'সুদানীয় রাষ্ট্র' ও 'সুদানীয় সভ্যতা' নামে পরিচিত। মিশরের উপর ফিনিসীয়, গ্রীক, রোমান সভ্যতার প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অপ্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণ আফ্রিকার সভ্যতার উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। রোমানরাই মিশর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিকে পুরোপুরি ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতা-প্রভাবিত অঞ্চলে পরিণত করে এবং আফ্রিকায় খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তন করে। এর ফলে কপটিক চার্চ নামে অভিহিত খ্রীষ্ট ধর্মের একটি শাখা গড়ে ওঠে। খ্রীষ্টধর্ম শুধু মিশরে নয়, ইথিওপিয়াতেও (আবিসিনিয়া) ছড়িয়ে পড়ে এবং ইথিওপিয়ার রাজবংশ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় সেখানে খ্রীষ্টধর্মই দেশের লোকের ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

সশস্ত্র যাযাবর উপজাতি, ভ্যানডাল ও বাইজানটিয়ানদের আক্রমণের ফলে রোমান আধিপত্য বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর দেখা দেয় নৈরাজ্য, তাণ্ডব ও বিশৃঙ্খলা। রোমান শাসনের অবসানকালের এই পরিস্থিতি কৃষ্ণ আফ্রিকার ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

মরুভূমির মধ্যে দিয়ে প্রসারিত বিভিন্ন পথে কৃষ্ণ আফ্রিকার সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার যেমন বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তেমনই এই সব পথে লিবিয়ার বারবার জাতির লোকেরা কৃষ্ণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে অশ্বচালিত রথে হানা দিত এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। কৃষ্ণ আফ্রিকার সঙ্গে বারবারদের সম্পর্ক বহুকালের। সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম সহস্রাব্দ থেকেই (যখন সাহারায় প্রচুর বর্ষণ হত এবং সাহারা ছিল সবুজ ঘাসে ভরা) এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বারবাররা ছিল পশুপালক ; সাহারা মরু অঞ্চলে পরিণত হলে তারা ক্রমেই কৃষ্ণ আফ্রিকার দিকে সরে যায় তাদের চারণ-ভূমির সন্ধানে। বারবাররাও নিগ্রো, কাজেই কৃষ্ণ আফ্রিকার অন্যান্য নিগ্রোদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল সহজতর। এর ফলে বারবারদের মাধ্যমে কৃষ্ণ আফ্রিকার ব্যবসাবাণিজ্য প্রসার লাভ করে এবং মরুভূমির মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হয় দীর্ঘ বাণিজ্য-পথ।

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে কৃষ্ণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকগোষ্ঠী ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। এই সময় কৃষ্ণ আফ্রিকায় সকল ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে।

বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় রাজ্য স্থাপিত হয়। কৃষিনির্ভর গ্রাম জীবনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা স্বয়ম্ভর সম-সমাজের অবসান ঘটে, দেখা দেয় শ্রেণী-সমাজ যে সমাজে রাজাই সর্বেসর্বা। তাঁর মন্ত্রণাদাতা পুরোহিত এবং শাসন ও শোষণে সাহায্যকারী আমলাবৃন্দ নিয়ে গড়ে ওঠে এক শক্তিশালী শাসকগোষ্ঠী। কৃষ্ণ আফ্রিকায় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় দুই ভাবে : উত্তর আফ্রিকার উন্নত দেশগুলি থেকে আগত কোন রাজা বা রাজবংশের লোক বা কোন সেনাপতি বাহুবলে কৃষ্ণ আফ্রিকার কোন অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে। কৃষ্ণ আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি সেই সব অঞ্চলের মানুষের মনে, বিশেষ করে গোষ্ঠীপতি বা সমাজের নেতাদের মনে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি গড়ে তোলার বাসনা জাগায় এবং এর ফলে শক্তিশালী কোন গোষ্ঠীপতি বা সমাজ নেতা সকলের সমর্থনে রাজারূপে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। এই দুই পদ্ধতিতেই কৃষ্ণ আফ্রিকায় কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। তবে সকল ক্ষেত্রেই রাজশক্তিকে স্থানীয় রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারকে যথাসম্ভব মেনে নিয়ে জনসাধারণের কাছে নিজের 'বৈধতা'র প্রমাণ দিতে হয়েছে।

পয়গম্বর মহম্মদ তাঁর একেশ্বরবাদ প্রচার করে অসংখ্য বিবদমান গোষ্ঠীতে বিভক্ত আরবদের ঐক্যবদ্ধ করার পর আরবদের মধ্যে এল এক নতুন জাগরণ। তাদের জীবনের ধারা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হল। আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতি সারা পৃথিবীতে বিস্ময় জাগাল। রণদুর্মদ আরব বাহিনীর অপ্রতিহত বিজয় অভিযান বড় বড় প্রাচীন সাম্রাজ্যের পতন ঘটাল।

আরবরা মিশরে প্রথম উপস্থিত হয় ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকেই তারা সমগ্র উত্তর আফ্রিকা দখল করে দক্ষিণ ইয়োরোপে হানা দেয়। কিন্তু সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করে কৃষ্ণ আফ্রিকায় উপস্থিত হতে তাদের অনেক বিলম্ব ঘটে। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমে দ্বাদশ শতাব্দির আগে এবং পূর্ব দিকে নিউবীয় খ্রীষ্টান রাজশক্তির (ডোংগোলা রাষ্ট্র) পতন না ঘটা পর্যন্ত অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর আগে তারা কৃষ্ণ আফ্রিকায় হানা দেওয়ার কথা ভাবেনি। কিন্তু ইসলামের বাণী ও আরব সংস্কৃতি নিগ্রো ভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছিল তারা উত্তর আফ্রিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

কৃষ্ণ আফ্রিকার 'সুদানীয়' (Sudanic) রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম রাষ্ট্র হল ঘানা (বর্তমান ঘানার নিকটতম সীমান্ত থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় পাঁচ শত মাইল দূরে প্রাচীন ঘানা রাজ্যের রাজধানী অবস্থিত ছিল)। কবে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আজও জানা যায়নি, তবে অল ফাজারীর রচনা থেকে বুঝতে পারা যায়

যে, অষ্টম শতাব্দীতে ঘানা 'সোনার দেশ' নামে মরক্কোয় খ্যাতিলাভ করেছিল। ঘানা রাজ্য গড়ে ওঠে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে।

উত্তর নাইজার ও সেনেগালের স্বর্ণসমৃদ্ধ নদী-উপত্যকাগুলির উত্তরে অবস্থিত ঘানা রাজ্য আরবদের কাছে ওয়ানগারা নামে পরিচিত ছিল

ঘানা ও পশ্চিম সুদানে তার পরবর্তী রাজ্যগুলির সমৃদ্ধির মূলে ছিল উত্তরে সোনা রপ্তানী এবং দক্ষিণে লবন ও অন্যান্য পণ্য আমদানির একচেটিয়া অধিকার।

ঘানার ঐশ্বর্য আরবদের বিস্মিত করেছিল। সোনার কারবারই ছিল প্রধান কারবার। সোনা ছাড়া হাতীর দাঁত ও অন্যান্য পণ্য রপ্তানী করা হত। দাস রপ্তানীও করা হত, কিন্তু ক্রীতদাস প্রথায় যে ধরনের দাস বোঝায় তখন আফ্রিকা থেকে পাঠানো দাসরা সে রকম ছিল না। প্রধানত ধনীগৃহে কাজকর্মের জন্য এবং কোন পরিবারের কর্মচারীরূপে কাজকারবার চালানোর জন্য এইসব দাস কেনা হত। এদের দাম ছিল খুব বেশি এবং এদের সামাজিক মর্যাদাও কম ছিল না।

ঘানার শক্তি ও ঐশ্বর্যের কাহিনী আফ্রিকা এবং আরব দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কাহিনী শুনেই ৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পর্যটক ইবন হকাল লিখেছিলেন যে, ঘানার রাজা পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী এবং ঘানার রাজবংশ 'প্রাচীনকাল' থেকে রাজত্ব করছে। ইবন হকাল বলেন যে, তিনি পশ্চিম সাহারা অতিক্রম করে দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্তম বাণিজ্য-কেন্দ্র আওদাগোস্ত-এ উপনীত হয়েছিলেন। এই বাণিজ্যকেন্দ্র ও নগরী এখন মৌরিটানিয়াবাসীদের বসতি তেগদাউস্ত-এর মাটির নীচে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পর্যটক ইবন হকাল একজন বণিকের একটি রসিদ দেখেছিলেন। রসিদে দেখা যায় যে উক্ত বণিক ৪২ হাজার স্বর্ণ দিনার মূল্যের কারবার করেছেন। এই রকম মোটা অঙ্কের কারবার আজকের দিনের পক্ষেও বেশ বড় কারবার সন্দেহ নেই।

৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে ঘানার শাসকরা আওদাগোস্ত নগরীকে তাঁদের বাণিজ্য ও কর-সংগ্রহ ব্যবস্থার আওতায় এনে দূর-পাল্লার আমদানি-রপ্তানী-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেন। ১০৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সঠিক তথ্যের উপর নির্ভর করেই আল বকরি দেখিয়েছেন যে, ঘানা রাজের কায়া মাঘান বা সোনার প্রভু উপাধিটা অর্থহীন নয়। বিভিন্ন পণ্যের উপর শুল্ক বসিয়ে কি করে ঐশ্বর্য বাড়াতে হয় তা ঘানা নৃপতি-দের বেশ ভালভাবেই জানা ছিল।

মিশরে আরবদের শাসন যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইসলাম ধর্মের উন্মাদনা এবং তজ্জনিত ঐক্যবোধ শিথিল হয়ে গেছে। খলিফার পদ নিয়ে তীব্র বিরোধ ও দলা-

দলি দেখা দিয়েছে। তবু যাঁদের হাতে যখন ক্ষমতা এসেছে তাঁদের নেতৃত্বে আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তার ও ধর্মপ্রচার অক্ষুণ্ণ থেকেছে। তবে বিশুদ্ধ আরব নেতৃত্বের অবসান ঘটেছে, ইসলাম ধর্মে নবদীক্ষিত বারবার ও অন্যান্য জাতি বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং স্পেন এ সময় আরবদের পদানত। মিশরকে কেন্দ্র করে উত্তর আফ্রিকায় গড়ে উঠেছে এক বিপুল সমৃদ্ধিশালী রাজ্য।

১০৬২ খ্রীষ্টাব্দে মৌরিটানিয়ায় আরব বারবার[১] বাহিনী ঘানা রাজ্য আক্রমণ করে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে তারা ঘানার রাজধানী অধিকার ও লুণ্ঠন করতে পারেনি। এ সত্ত্বেও আরব-বারবাররা শেষরক্ষা করতে পারল না, লুঠের বখরা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদের ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ল তখন ঘানা আবার তার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে, তবে আগের বিশাল সাম্রাজ্য আর সে ফিরে পায়নি। বিশেষ করে বাণিজ্য ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায় তার অর্থনৈতিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ঘানা রাজ্যে ভাঙন ধরে, কিন্তু আরও দক্ষিণে মরুভূমি থেকে আরও দূরে বিস্তীর্ণ কৃষি-প্রধান অঞ্চলে গড়ে ওঠে নিগ্রোদের মান্‌ডে উপজাতির এক বিশাল সাম্রাজ্য যার নাম মালি। মালির প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট সুনদিয়াতা রাজত্ব করেন ১২৩০ থেকে ১২৫০ সাল পর্যন্ত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুনদিয়াতা বুঝেছিলেন যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁর অনেক সুবিধা হবে।

সুনদিয়াতা হয়তো নামেই মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। একজন মুসলিম শাসকের রাজ্য হিসাবে আরব দুনিয়ায় তাঁর রাজ্য বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল এবং বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটেছিল। গিনির পরবর্তী মান্‌শা বা সম্রাটরা মক্কায় হজ করতে যেতেন এবং আরব দুনিয়ায় অনেক কিছু জেনে দেশে ফিরতেন। এই যোগাযোগের ফলে পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলাম শুধু রাজারাজড়া নয়, সাধারণ মানুষের ধর্ম হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই এর পরিণতি স্বরূপ পশ্চিম আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চিরাচরিত রীতিনীতি ও নিয়মকানুনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

গিনি ও সোংহাই সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষেই বড় সাম্রাজ্য ছিল। মালির সম্রাটদের হুকুম বলবৎ হত নাইজার উপত্যকাস্থিত রাজধানী নিয়ানি থেকে পশ্চিম অতলান্তিক মহাসাগরের উপকূল এবং পূর্বে হাউসাভূমির সীমান্ত পর্যন্ত।

প্রথমে সোংহাই-এর রাজারা মালি সম্রাটের অধীন ছিলেন, কিন্তু ক্রমেই মালির,

১ পূর্ব আফ্রিকার বারবার উপজাতিগুলির কতকাংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ও আরব সভ্যতা-প্রভাবিত হয়ে কিছু কালের জন্য আফ্রিকায় এক প্রবল শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

আধিপত্যের বিরুদ্ধে তাঁদের মনোভাব তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (অনুমান ১৪৬৪-৯০) সোন্‌নি আলি মালি-সম্রাটকে পরাজিত করে স্বাধীন-রাজ্য স্থাপন করেন। প্রথমে ইসলাম-বিরোধী রাজ্যরূপে গড়ে উঠলেও পরবর্তী শাসক তাঁর মান্‌ডে উপজাতির সেনাপতি আসকিয়া মহম্মদ (১৪৯৩-১৫২৮) সোংহাই রাজ্যে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটান। এ সময় সোংহাই বিপুল শক্তি অর্জন করে একটি বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। মালির চাইতেও বৃহত্তর এই সাম্রাজ্যের সীমান্ত বিস্তৃত হয় উত্তরে সাহারার লবণ খনিগুলি এবং প্রায় মরক্কোর সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বে প্রায় বোরনু পর্যন্ত। সোংহাই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল গাও-এ। মালি সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য, শক্তি ও শাসন ব্যবস্থা আরব ও অন্যান্য জাতিকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল। খ্যাতনামা পর্যটক ইবন বতুতা মালি ভ্রমণ কালে (১৩৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) লিখেছিলেন যে নিগ্রোরা ক্বচিৎ অন্যায় করে। অন্যান্য জাতির তুলনায় তাদের অন্যায় সম্পর্কে ভীতি অনেক বেশী। কেউ বিন্দুমাত্র অন্যায় করলে তাদের সুলতান তার প্রতি কোন দয়া দেখান না। দেশে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিদ্যমান। পর্যটক বা অধিবাসী কারুরই ডাকাত বা গুণ্ডাদের হাতে পড়ার কোন ভয় নেই।

বাণিজ্য ও কৃষি মালিকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছে এবং বিদেশী ও ব্যবসায়ীরা মালিতে নিরাপদে বাস করতে ও কেনাকাটা করতে পারে একথাও ইবন বতুতা বলেছেন।

মালির সবচেয়ে বিখ্যাত সম্রাট মুসা কায়রো হয়ে মক্কা যাওয়ার সময় তাঁর ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়ে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি এত সোনা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন যে, কায়রোর বাজারে এই সোনা ছাড়ার ফলে মিশরে সোনার দর পড়ে যায়। 'নিগ্রোদের প্রভু' নামে খ্যাত মানসা মুসাদের সাম্রাজ্য মালিই ইয়োরোপে পশ্চিম আফ্রিকার প্রথম মানচিত্রে স্থান লাভ করে।

সম্রাট মুসার দেখাদেখি সোংহাই সম্রাট আসকিয়া মহম্মদ মক্কা ভ্রমণ কালে আরও জাঁকজমকের সঙ্গে তাঁর বিপুল ঐশ্বর্যের পরিচয় দেন।

মধ্যযুগে ছোটবড় আরও অনেক রাষ্ট্র কৃষ্ণ আফ্রিকায় গড়ে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে বেনিন রাষ্ট্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পর্তুগীজদের আগমনের তিনশ বছর আগে বেনিনের রাজবংশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। বেনিনের নাগরিক সভ্যতা ইয়োরোপীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাদের মতে বেনিন ইয়োরোপীয় নগরীগুলির সমতুল্য ছিল। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ওলন্দাজ এই বেনিন নগরী দেখে লিখেছিলেন শহরটা খুব বড় বলেই মনে হয়। শহরে প্রবেশ করলে আপনি এক

বিরাট চওড়া রাস্তা পাবেন, বাঁধানো নয়, তবে আমস্টারডামের ওয়ারমোজ সরণী থেকে ৭/৮ গুণ চওড়া, সোজা চলে গেছে কোথাও বাঁকেনি।

মধ্যযুগে কৃষ্ণ আফ্রিকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি উন্নত স্তরে উঠেছিল। ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, ধাতুনির্মিত দ্রব্য, দারুশিল্প প্রভৃতির নিদর্শন তার সাক্ষ্য বহন করছে।

নির্মম প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিজেদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সংগ্রাম করে এবং প্রাচীন মিশরীয় তথা ভূমধ্য সাগরীয় সভ্যতা ও মধ্যযুগে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত আরবদের সভ্যতার সংস্পর্শে এসে কৃষ্ণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ যখন তাদের অর্থ ব্যবস্থা, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করে আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে ঠিক তখনই কৃষ্ণ আফ্রিকার দিগন্তে ঘনিয়ে এল সংকটের কালো মেঘ। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও জমির অভাব এই সংকটের প্রধান কারণ নয়, এর প্রধান কারণ হল ইয়োরোপে লুণ্ঠনধর্মী বণিক সভ্যতার অভ্যুদয়।

কৃষ্ণ আফ্রিকার এই সংকটকাল, সংকট বিধ্বস্ত কৃষ্ণ আফ্রিকার দুর্গতি এবং সংকট ত্রাণে কৃষ্ণ আফ্রিকার সংগ্রাম—বিশেষ করে, পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে মুক্তি যুদ্ধের প্রসার ও আংগোলা, মোজাম্বিক, কেপ ভারদে, সাও তোম প্রভৃতি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবওয়েতে (রোডেশিয়া) কৃষ্ণ আফ্রিকার শেষ মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

১

সোনা ? হলদে, চকচকে মূল্যবান সোনা ?
…এর অনেকখানি সাদাকে কালো,
মন্দকে ভাল,
ভুলকে ঠিক, নীচকে মহৎ,
বুড়োকে যুবা, ভীরুকে বীর
বানাতে পারে

সেক্সপীয়র : টাইমন অব এথেন্স

"আমি দেখেছি পৃথিবীর এই অংশে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদের অজুহাত চমৎকার ও আধ্যাত্মিক হলেও এ সবের শেষ লক্ষ্য, ও প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সোনা, প্রাধান্য এবং পার্থিব গৌরব।" —ক্যান্টারবেরির আর্চ বিশপ, ১৬৯০

সোনার জন্য পাগল হয়ে উঠল ইয়োরোপ। শুধু ব্যক্তির নয়, রাষ্ট্রেরও ঐশ্বর্যের মূলে আছে সোনা এই ধারণা তখন ইয়োরোপকে পেয়ে বসেছে। এর আসল কারণ হল সমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন। মানুষ তার উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রবল জলস্রোতের সাহায্যে ময়দার কল চালানো, ভারি ভারি হাতুড়ি ব্যবহারের, খনি থেকে আকরিক ধাতু উত্তোলনের কৌশল আয়ত্ত করেছে। ধাতু গলানো এবং তা' ব্যবহারোপযোগী করার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হওয়ায় ধাতু শিল্পে বিশেষ অগ্রগতি

ঘটেছে। সমুদ্রগামী বড় বড় উন্নত ধরনের জাহাজ (কারাভেল) তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও অনেক অগ্রগতি ঘটেছে। আগের থেকে অনেক নির্ভুলভাবে লক্ষ্যভেদ করার মত বন্দুক (মাসকেট) তৈরী হয়েছে। মুদ্রণ-যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় বই ছাপার সুবিধা হয়েছে।

এর নিট ফল দাঁড়াল এই যে, একদিকে বেশ বড় আকারের কারখানা গড়ে উঠতে লাগল, অন্যদিকে উৎপাদন আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেল। এসব ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী ছিল বণিকরা এবং এবার তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তাদের হাতে তখন বিপুল অর্থ। বাণিজ্য দ্রুত বেড়ে চলেছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অবাধ স্বাধীনতা ও আরও বেশী সুযোগ সুবিধার দাবিতে বণিকশ্রেণী সোচ্চার হয়ে উঠল। রাজারাজড়া ও সামন্তদের অর্থের প্রয়োজন বাড়ছে, অথচ আয় বাড়ছে না, কাজেই তাদের হাত পাততে হচ্ছে বণিকদের কাছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নিতে হচ্ছে। এইভাবে সামন্ততন্ত্রের 'শেষের সে দিন' ঘনিয়ে এল।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এ সব ব্যাপার প্রধানত ঘটল পর্তুগাল ও স্পেনে। এই দুটি দেশ এই সময় ইয়োরোপে সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী ও প্রবল হয়ে উঠেছিল।

বাণিজ্য বাড়ছে, আরও বাড়াতে হবে, কিন্তু তার জন্য চাই আরও সোনা রূপো। কারণ এগুলো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মূল্যবান ধাতু। মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা এই ধরনের স্থায়ী ও সঞ্চয়যোগ্য ধাতুরই আছে। কাজেই 'সোনা চাই, আরও সোনা চাই' এই রব উঠল।

বণিকদের দৌলতে রাজারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন, সামন্তদের উপর তাঁদের নির্ভরতা অনেক কমে গিয়েছিল। তাই রাজারা বণিকদের দাবি সমর্থন করে ক্ষান্ত থাকলেন না, তাঁরা তাদের সোনারূপা সংগ্রহের সমস্ত উদ্যোগে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে লাগলেন।

আরবদের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে স্পেনীয় ও পর্তুগীজরা দু'টি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়েছিল। ক্রমে আরও শক্তি সঞ্চয় করে তারা আরবদের কবল থেকে শুধু তাদের দেশকে মুক্ত করতে সমর্থ হল তা নয়, তারা আরবদের জিব্রালটার প্রণালী পার করে দিয়ে একেবারে মরক্কোয় হাজির হয়েছিল। মরক্কোয় তারা আর সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু এইসব অভিযানে তারা অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল, অনেক কিছু জেনেছিল। তারা জানতে পেরেছিল যে, সাহারা মরুভূমির ওপারে গিনি বলে একটি রাজ্য আছে যার সোনার ভাণ্ডার অফুরন্ত। পূর্ব

আফ্রিকায় আরবরা জলযানে যাতায়াত করে এবং আরব ভৌগলিকরা মনে করেন যে, সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ সমুদ্রবেষ্টিত এ খবরও তারা পেয়েছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে এশিয়া ও আফ্রিকার পণ্যসম্ভার এসে পৌঁছুত ভেনিসের মাধ্যমে। ভেনিসের বিপুল ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি দেখে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের বণিকরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরত, কিন্তু কিছু করার ছিল না। ভেনিসের সঙ্গে যোগ ছিল মুসলমান বণিকদের। তাদের অসংখ্য বাণিজ্যতরী এসে ভিড়ত ভেনিস ও ইতালীর বিভিন্ন বন্দরে। মুনাফার সিংহভাগ পেত ভেনিসের ব্যবসায়ী ও বণিকরা। ভেনিসকে হটাতে হলে প্রবল পরাক্রান্ত মুসলিম শক্তিকে হটাতে হয়। তখনও পর্যন্ত সে রকম কিছু করার ক্ষমতা ইয়োরোপের কোন দেশেরই হয়নি। কাজেই বাণিজ্যের নতুন পথ উন্মুক্ত করার চেষ্টাতেই উঠে পড়ে লেগে গেল ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র। এ ব্যাপারে অগ্রণী হল স্পেন ও পর্তুগাল।

দুঃসাহসী অভিযাত্রী দল বেরিয়ে পড়ল নতুন বাণিজ্য পথ ও নতুন দেশের সন্ধানে। সেদিন ভারতবর্ষের নাম ফিরত ইয়োরোপের বণিকদের মুখে মুখে। আশ্চর্য, ঐশ্বর্যভরা ভারতবর্ষ তাদের কাছে ছিল এক পরম বিস্ময়। এই আকাঙ্ক্ষিত দেশের উদ্দেশ্যেই পাড়ি দিয়েছিলেন সীমাহীন মহাসমুদ্রে স্পেনের কলম্বাস। স্পেনের রাজা হেনরি (যিনি নৌঅভিযানে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্যে হেনরি দ্য ন্যাভিগেটর নামে ইতিহাসে খ্যাত হয়েছেন) এবং বণিকরা সবকিছু যোগাড় করে দিয়েছিলেন কলম্বাসকে। ভুল পথে অগ্রসর হয়ে কলম্বাস পৌঁছেছিলেন এক নতুন মহাদেশ আমেরিকায়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, তিনি ভারতবর্ষেই উপনীত হয়েছেন, দেশে ফিরেও তিনি সেই কথাই বলেন। এর পরেই শুরু হয় স্পেনের সাম্রাজ্য বিস্তারের পর্ব। সে আর এক কাহিনী।

ভারতবর্ষে যাওয়ার নতুন পথ আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেছিল পর্তুগীজরা। আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে ভাস্‌কো-দা-গামার নেতৃত্বে পর্তুগীজ অভিযাত্রীদল ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিল ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে।

স্পেন ও পর্তুগালের নৌ-অভিযান আমেরিকা ও আফ্রিকার আদিবাসী মানুষদের জীবনে এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ ডেকে আনল।

পর্তুগীজ অভিযাত্রীদল কৃষ্ণ আফ্রিকায় প্রথম পদার্পণ করে ১৪৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। তারা উপনীত হয় কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জে এবং সেনেগাল নদীর মোহনায়। মালি রাজ্যের খবর পর্তুগীজরা আগেই পেয়েছিল। তারা মালির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জে ঘাঁটি গাড়ল। ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই

পর্তুগীজরা গোল্ড কোস্ট বা স্বর্ণ উপকূলে হাজির হল। সোনার ছড়াছড়ি এই অঞ্চলে, তাই এই অঞ্চলের নাম স্বর্ণ উপকূল। পর্তুগীজরা খুব খুসী। অন্যান্য ইয়োরোপীয় শক্তি যাতে স্বর্ণ উপকূলে পদার্পণ করতে না পারে তার জন্য ১৪৮২ সালে তারা এলমিনে সারি সারি দুর্গ নির্মাণ করে নিজেদের ঘাঁটি শক্ত করল। ইতিমধ্যে বেনিন ও আরও দুটি শক্তিশালী আফ্রিকান রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হওয়ায় পর্তুগীজরা আফ্রিকায় তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ও প্রভাব বাড়ানোর সুযোগ পেল।

১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্থেলোমিউ দিয়াজ আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে কেপ অব গুড হোপ অতিক্রম করলেন। এর পরেই পেড্রো দা বোভিলহীন চিরাচরিত পথ ধরে পৌঁছুলেন ইথিওপিয়া ও ভারতবর্ষে। ভাসকো-দা-গামার সাফল্য এরই পরিণতি।

পর্তুগীজদের এই সাফল্য মিশর ও ভেনিসকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। ভারত মহাসাগরে তারা পর্তুগীজদের আক্রমণ করল। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে দিউ-এর উপকূলে এক প্রচণ্ড নৌযুদ্ধে জয়ী হয়ে পর্তুগীজরা তাদের শক্তির পরিচয় দিল। পর্তুগীজরা একদিকে সেনেগাল থেকে লোহিত সাগরের যে কোন অঞ্চল থেকে উত্তর আফ্রিকায় প্রবেশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা পেল এবং অন্যদিকে ভারত মহাসাগরের পশ্চিমাংশের সমগ্র বাণিজ্য তাদের করায়ত্ত হল।

তুরকীরা (অটোম্যান টার্ক) এ সময় পরাক্রান্ত হয়ে ওঠায় পর্তুগীজরা প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে লেপান্তোর নৌ-যুদ্ধে তুরকীদের পরাজয় সে বাধা দূর করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে তুরকীদের পরাজয় ইয়োরোপের উদীয়মান অন্যান্য শক্তির প্রাচ্য অভিযানের পথ উন্মুক্ত করে।

স্পেন ও পর্তুগাল উপনিবেশ ও বাণিজ্য বিস্তার করে ইয়োরোপের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হওয়ায় হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বণিকরা তৎপর হয়ে ওঠে। শুরু হয় তীব্র রেষারেষি।

কৃষ্ণ আফ্রিকায় এ সময় একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

সম্ভবত খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে ইন্দোনেশীয়রা দুর্লঙ্ঘ্য মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে উপনীত হয়েছিল। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, পারসিকরাও এই সময়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছিল। পরে আরবরাও যায়। এই সব অভিযাত্রীরা আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগেও প্রবেশ করে। এদের কাছ থেকে আফ্রিকানরা নতুন নতুন ফসল ফলাতে শেখে। এ ব্যাপারে ইন্দোনেশীয়রাই তাদের বিশেষ সাহায্য করে বলে মনে হয়।

ইন্দোনেশীয়রা শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে তাদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখেনি। তারা মাদাগাসকার (আজকের মালাগাসি) দখল করে সেখানে আধিপত্য স্থাপন করে।

ইন্দোনেশীয়দের কাছ থেকে আফ্রিকানরা কলা, নারকেল, লবঙ্গ, আদা, গোলমরিচ, আখ প্রভৃতি চাষ করতে শেখে। অমৃতফল আমের খবরও তারা ইন্দোনেশীয়দের কাছ থেকে পায়। নিকৃষ্ট এক ধরনের ধানের আবাদ আফ্রিকানরা অনেক আগে থেকেই করত। ইন্দোনেশীয়রা তাদের উৎকৃষ্ট ধানের আবাদ করতে শেখায়। নতুন নতুন ফসল আফ্রিকানদের খাদ্যাভাব দূর করতে সাহায্য করে এবং এর ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে জমির চাহিদা বেড়ে যায়। এক উপজাতি অন্য উপজাতির জমি, এক রাজ্য অপর রাজ্য অধিকার করার জন্য লড়াইতে নেমে পড়ে।

কৃষ্ণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে এই ধরনের বিবাদ বিসম্বাদ অন্য অনেক দেশের মতই স্বাভাবিকভাবে ঘটেছিল এবং বাইরে থেকে কেউ হস্তক্ষেপ না করলে এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই বড় বড় রাজ্য গড়ে উঠতে পারত। বিভিন্ন উপজাতির সংমিশ্রণে নতুন নতুন জাতিসত্তার উদ্ভব হত। কিন্তু তা হল না, লৌহযুগ যখন বড় রকমের পরিবর্তন ঘটাতে চলেছে, যখন নতুন নতুন ফসল ফলিয়ে আফ্রিকানরা কৃষি সম্পদের অধিকারী হয়েছে ঠিক তখনই তাদের দুয়ারে হানা দিল ইয়োরোপীয়রা।

পর্তুগীজদের সংস্পর্শে এসে আফ্রিকানরা ভুট্টা, চীনাবাদাম, আনারস, মিষ্টিআলু, টম্যাটো, কোকো, তামাক, পেঁপে, লাউ, লঙ্কা প্রভৃতি চাষ করতে শেখে। এ সবই আমেরিকার শস্য। এর ফলে জমির চাহিদা আরও বেড়ে যায় এবং বিবাদ বিসম্বাদও তীব্রতর হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিরোধের চাইতেও অনেক বেশী বিপদ দেখা দিল ইয়োরোপীয়দের অধিকার বিস্তারকালে। এই বিপদের মূলে ছিল আফ্রিকার প্রতি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের লুব্ধ দৃষ্টি।

পর্তুগীজরা যখন আফ্রিকায় পদার্পণ করল তখন আফ্রিকার কোন জায়গা দখল করার বাসনা তাদের ছিল না। আমেরিকা ও এশিয়ার দিকেই পর্তুগীজ ও অন্যান্য ইওরোপীয় শক্তির দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ। সোনা ও হাতির দাঁত সংগ্রহ করা এবং সুবিধামত স্থানীয় অধিবাসীদের ধরে দাসরূপে চালান দেওয়া—এই ছিল পর্তুগীজদের কাজ। এর জন্য আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করার প্রয়োজন তাদের হয়নি।

এ সময় অর্থাৎ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে কৃষ্ণ আফ্রিকায় কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটার ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বড় রকমের

পরিবর্তনের সূচনা হয়। ধীরে হলেও অনিবার্যভাবে কৃষ্ণ আফ্রিকায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। চিরাচরিত রীতিনীতি ও প্রথার পরিবর্তন ঘটিয়ে রাজারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়। রাজারা ও তাঁদের পারিষদবর্গের অধিকাংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় ইসলামী রীতিনীতি ও আইনকানুন প্রাধান্য লাভ করে এবং এর ফলে পরিবর্তন দ্রুততর হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে কৃষ্ণ আফ্রিকার অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র বোরনু তুরকীদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে এবং তুরকী সামরিক শিক্ষাদাতাদের নিয়োগ করে আধুনিক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলে। দাস ব্যবসায় প্রসার লাভ কালে এর মারাত্মক পরিণতি ঘটে।

যাই হোক, চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রাচীন কানেম রাজবংশ বুলালা উপজাতির হাতে পরাজয় বরণ্ করে তাদেরই সাম্রাজ্যের বোরনুতে যখন আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন তখন তাঁরা আবার প্রবল হয়ে উঠবেন এ কথা কেউ ভাবেনি। আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত বোরনুরাজ মাই ইদ্রিস আলুমার সৈন্যবাহিনী শুধু বুলালাদের প্রতিহত করল না, চাদ হ্রদের উত্তর ও পূর্বদিকে বুলালাদের উপর বোরনুরাজের আধিপত্যও প্রতিষ্ঠা করল। কালক্রমে চাদ হ্রদের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বোরনু সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হল।

শুধু বোরনু নয়, ইয়োরোপীয়দের আগমনকালে পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বেশ কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। বাণিজ্যই ছিল এই সব রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উপায়, তাই ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে বাণিজ্য করার সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে এই সব রাষ্ট্র সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। সোনা, হাতির দাঁত, মশলা এবং দাসের বিনিময়ে এই সব রাষ্ট্র পেত কাপড়চোপড়, লোহা ও অন্যান্য ধাতু দিয়ে তৈরী জিনিসপত্র, মদ, আগ্নেয়াস্ত্র। ক্রমেই সোনা ও অন্যান্য জিনিসের চেয়ে দাসের কদর বাড়তে থাকল এবং রাজা থেকে আরম্ভ করে অর্থলোভী বহু লোক দাস-ব্যবসায় মেতে উঠল।

দাস-ব্যবসা ব্যাপক আকারে শুরু করে পর্তুগীজরা। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তারা স্পেনের অধিকৃত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে দাস চালান দিতে থাকে। নিজেদের উপনিবেশগুলিতেও তারা গোড়া থেকেই দাস চালান দিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেন, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যখন উপনিবেশ বিস্তারে মেতে উঠল তখন দাস-ব্যবসায়ও ফেঁপে উঠল। পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ের এই আদিযুগে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, ব্রাজিল প্রভৃতি অঞ্চলে বড় বড় আখের বাগিচা গড়ে উঠে। চিনির চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় ইয়োরোপীয় দেশগুলি নিজ নিজ উপনিবেশে চিনি উৎপাদনে মনোনিবেশ

করে। আখের চাষ ও চিনি উৎপাদনের জন্য খুব বেশী লোকের দরকার হয়। লোকের চাহিদা মেটানোর একমাত্র উপায় ছিল দাস সংগ্রহ করা।

ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীরা এশিয়ায় তাদের উপনিবেশগুলি থেকে দাস বা খত লিখে দেওয়া শ্রমিক সংগ্রহ করত, কিন্তু তাতে চাহিদা মিটত না। কাজেই আফ্রিকা থেকে দাস আমদানি করা ছাড়া উপায় ছিলনা। প্রথম দিকে আফ্রিকায় পর্তুগালের আধিপত্য থাকায় পর্তুগীজরাই দাস-ব্যবসায়ে অগ্রণী হয়। দাস-ব্যবসায়ে পর্তুগালের প্রাধান্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ওলন্দাজরা ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণ উপকূল থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করার পর থেকেই পর্তুগীজরা দাস-ব্যবসায়ে প্রাধান্য হারায়। শেষ পর্যন্ত দাস-ব্যবসায়ে প্রাধান্য লাভ করে ইংল্যাণ্ড।

দাস ব্যবসায়ের ক্রমবিস্তারের সূচনা কাল থেকেই কৃষ্ণ আফ্রিকার আধুনিক ইতিহাস শুরু।

২

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
কালো অবগুণ্ঠনের তলে
আছিলে অপরিচিতা তব প্রতিবেশিনীর কাছে।
রূপমদোদ্ধত ইয়ুরোপ
দস্যু-বেশে গিয়েছিল দীপহীন তোমার প্রাঙ্গণে—
তোমার বক্ষের পরে চালায়েছে রথ,
যেখানে বেদনা-ভরা মানব-হৃদয়
তরুচ্ছায়ে ছিল প্রসারিত।
সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করেছিল অন্ধকারে
নির্লজ্জ অমানুষিতা।

—রবীন্দ্রনাথ

ক্রমে আফ্রিকায় সোনা, হাতির দাঁত এবং অন্যান্য জিনিসের কারবারের চাইতে দাসের কারবারই বেশী ফেঁপে উঠল। দাস-ব্যবসায় ফেঁপে ওঠার পিছনে ছিল এক মর্মান্তিক ইতিহাস। স্পেন ও পর্তুগালের অভিযাত্রী-বাহিনী শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে আদিবাসীদের (কলম্বাস এই আদিবাসীদের ভারতীয় বলে ধরে নেওয়ায় ইণ্ডিয়ান বলা হয় এবং গায়ের রং তামাটে বলে 'রেড' বা লাল বলে বিশেষিত করা হয়)

প্রায় নির্মূল করে দেয়। আদিবাসীরা নতি স্বীকার করেনি। এই অপরাধে তাদের ছোট বড় নির্বিশেষে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এর ফলে দেখা দেয় লোকাভাব। কাজের লোক চাই, নইলে কাজ চলবে কি করে? অতএব বিজেতাদের নজর পড়ল আফ্রিকার উপর। মানুষ-শিকারের ধুম পড়ে গেল কৃষ্ণ আফ্রিকায়। পর্তুগাল তখন আফ্রিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সোনা, হাতির দাঁত ও দাস রপ্তানি এবং ইয়োরোপ থেকে আফ্রিকায় কাপড়-চোপড়, লোহা ও ইস্পাতের তৈরী জিনিসপত্র, মদ ও আগ্নেয়াস্ত্র আমদানির কারবার তার জমে উঠেছে। স্পেনের সঙ্গে চুক্তি করে পর্তুগালই প্রতিবছর চার হাজারের উপর দাস সরবরাহের দায়িত্ব নিল।৮ পর্তুগালের অধিকৃত ব্রাজিলের জন্যেও বহু দাসের দরকার হয়। চিনির কারবার যত বাড়তে থাকে দাসের চাহিদাও তত বাড়ে। বিরাট বিরাট আখের বাগিচার জন্য হাজার হাজার লোকের দরকার হয়।

এবার অন্ধকার মহাদেশের অনগ্রসর ও অসভ্য মানুষদের খ্রীষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত করে সভ্য করে তোলার "পবিত্র দায়িত্ব" এবং আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য করার আইনসম্মত পন্থা শিকেয় তুলে যেন-তেন-প্রকারেণ মানুষ শিকারে নেমে পড়ল পর্তুগীজরা। দাস-ব্যবসায়ের জন্য পশ্চিম আফ্রিকার যে বিস্তীর্ণ উপকূল ভাগ "দাস উপকূল" (স্লেভ কোস্ট) নামে পরিচিত হয়েছিল সেই উপকূল ভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখতে দেখতে জনশূন্য হয়ে গেল। দাস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পর্তুগীজরা কৃষ্ণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করল।

১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজরা আফ্রিকার অন্যতম বৃহত্তম রাষ্ট্র বাকংগোর সংস্পর্শে আসে। বান্টু জাতির এই রাজ্যের রাজাকে বলা হত মানিকংগো। রাজধানীর নাম ছিল ম্বান্‌জা কংগো (বর্তমান আংগোলার উত্তরাঞ্চলের সান সালভাদোর)। সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কাতাংগার লুবা সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী কোনো গোষ্ঠী এই অঞ্চল দখল করে বাকংগো রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। বাকংগো রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা সুদক্ষ কর্মকার রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বেশ বোঝা যায় যে, বিজয়ী গোষ্ঠী অস্ত্র নির্মাণে এবং যুদ্ধ পরিচালনায় নিপুণ ছিল।

বাকংগো রাজ্যের আয়তন ছিল বিশাল এবং এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ লক্ষ। সামন্ত-নৃপতিদের মাধ্যমে বাকংগো রাজ তাঁর রাজ্য শাসন করতেন। এই রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ন্‌দোংগো রাজ্য। এই রাজ্যের রাজাদের বংশানুক্রমিক উপাধি ছিল ন্‌গোলা।

এই ন্‌গোলা থেকেই আংগোলা নামের উৎপত্তি হয়েছে।

পর্তুগীজরা বাকংগো রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে পাদ্রী, রাজমিস্ত্রি সূত্রধার এবং দক্ষ কারিগরদের বাকংগো রাজের কাছে পাঠিয়ে দিল। মানিকংগো তাঁর পরিবারবর্গ এবং কয়েকজন বড় বড় সামন্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন।

রাজধানীতে গড়ে উঠল প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকা শ্রেণী। তরুণ কংগোলীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে ইয়োরোপে পাঠানো হ'ল। এক-কথায় বলা যায় যে, পর্তুগীজ অভিভাবকত্বে বাকংগো রাজ্য আধুনিক জীবনের পথে পদক্ষেপ করল। কিন্তু অভিভাবক বা কল্যাণকামীর আসল চেহারা উদ্‌ঘাটিত হ'তে বেশী দিন লাগল না।

ন্‌জিংগা ম্‌বেন্‌বা নামক রাজ সিংহাসনের একজন উত্তরাধিকারী শুধু আনুষ্ঠানিক-ভাবে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকলেন না, দেশের মানুষকে তিনি সকল দিক থেকেই আধুনিক করে তুলতে চাইলেন। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর ন্‌জিংগার নতুন নামকরণ হয় আলফন্‌সো। ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান রূপে দেশকে পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলির আদর্শে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর এই চেষ্টায় বাদ সাধল পর্তুগীজরা। দাসের চাহিদা বেড়ে চলেছে, অথচ দাস সংগ্রহ করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।

দাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ করার কথা আলফন্‌সো ভাবেননি, কারণ ইয়োরোপীয় পণ্যাদির বিনিময়ে কিছু সংখ্যক দাস যোগান না দিয়ে তাঁর উপায় ছিলনা, কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত মানুষ হিসাবে তিনি দাস-ব্যবসায়কে ভাল চোখে দেখতেন না। তাঁর এই মনোভাব পর্তুগীজরা পছন্দ করেনি। ফলে পর্তুগীজ সাহায্য বন্ধ হয়ে গেল। এবার পর্তুগীজ অভিযানের নতুন পর্যায় শুরু হল। পশ্চিম-মধ্য আফ্রিকাতে "সভ্যের বর্বর লোভ" নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করল।

কৃষ্ণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মানুষ শিকার করার দায়িত্ব অর্পণ করা হল পাউলো দিয়াস দি নোভায়েসের উপর। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লোয়ানদায় ঘাঁটি স্থাপন করে পাউলো দি দিয়স বাকংগো রাজ্যের সীমান্তবর্তী ন্‌দোংগোর রাজাদের (ন্‌গোলা) বিরুদ্ধে শতাব্দীব্যাপী সামরিক অভিযানের সূচনা করলেন।

তখনও বাকংগো রাজ নিশ্চিন্ত। আইনত তার অধীনস্থ হলেও ন্‌গোলাদের রাজ্যে কি ঘটছে না ঘটছে তা নিয়ে মানিকংগ মাথা ঘামাতে রাজী হলেন না। পর্তুগীজরা মানুষ শিকারের জন্যে তখন পাগল হয়ে উঠেছে, মানুষের সন্ধানে তারা সর্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় বাকংগো রাজ্য বাদ পড়ার কোনো সম্ভবনা ছিলনা।

স্বল্পকালের মধ্যেই বাকংগো রাজ্যের দক্ষিনাঞ্চলে হানা দিল পর্তুগীজদের ভাড়া করা কৃষ্ণাঙ্গ শিকারীর দল। আলফনসো তখন নেই; ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তার উত্তরাধিকারীরা পর্তুগীজদের কাণ্ডকারখানা দেখে উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে বার বার পোপের কাছে আবেদন জানাতে থাকেন। বাকংগোর খৃষ্টান রাজাদের আবেদনে পোপ সাড়া দিলে একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই এই বিশ্বাস তাদের ছিল। পোপ সাড়াও দিয়েছিলেন। একদিকে পর্তুগীজদের মানুষ শিকার চলতে লাগল অব্যাহতভাবে অপর দিকে পোপের পর পোপ কড়া চিঠি পাঠাতে থাকলেন পর্তুগীজ সরকারকে। পর্তুগীজ সরকার নির্বিকারভাবে জানিয়ে দিলেন যে তারা নিরুপায়, কারণ প্রজাদের তারা বাগে আনতে পারছেন না।

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে নিরুপায় বাকংগো রুখে দাঁড়াল পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে। বেশ কিছুকাল ধরে যুদ্ধ চলল। শেষ পর্যন্ত পরাজিত বাকংগো আর সামলে উঠতে পারল না। বিরাট বাকংগো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। অভ্যন্তরীণ বিরোধ বিসম্বাদ চরমে উঠল। বাকংগো রাজ্য পরিণত হল কয়েকটি গ্রামের সমষ্টিতে।

বাকংগোর মত আর ও কয়েকটি বড় রাজ্যের সঙ্গে পর্তুগীজদের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে একটি হল জামবেসি নদীর ভাঁটি অঞ্চলের ভাকা-রাংগা রাজ্য। বর্তমান রোডেশিয়ার শোনা ভাষাভাষী জাতির এই রাজ্যের রাজার উপাধি ছিল মোয়েনে মোতাপা। পর্তুগীজরা বলত মোনো মাতাপা পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভাকাংরাগা রাজ্য উত্তরের দিকে সরে যায়। পর্তুগীজদের সঙ্গে যখন এই রাজ্যের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় তখন এই রাজ্যের রাজধানী ছিল প্রস্তর নির্মিত ভবন সমূহের ধংসস্তূপে ভরা প্রাচীন রাজধানীর প্রায় তিন শত মাইল উত্তরে। এই প্রাচীন রাজধানীই 'জিমবাবওয়ে' বলে অভিহিত হত। পুরাতত্ত্ববিদদের মতে মহা জিমবাবওয়ের প্রস্তর নির্মিত রাজধানী ও পাহাড়ের উপর গড়ে তোলা মন্দির একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছিল।

মোনো মাতাপাদের রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কারিবা গিরিসংকট থেকে সমুদ্র পর্যন্ত জামবেসি উপত্যকার সাত শত মাইল দীর্ঘ অঞ্চল এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রোডেশিয় মালভূমির উত্তর ও পূর্বাংশ এবং জামবেসি ও লিমপোপোর মধ্যবর্তী দক্ষিণ মোজাম্বিকের নিম্নভূমিও মোনো মাতাপার শাসনাধীন ছিল। কিন্তু মহাজিমবাবওয়ে ও বুলাওয়েও-র মধ্যবর্তী যে অঞ্চল মোনো মাতাপারা ছেড়ে উত্তরে সরে গিয়েছিল সে অঞ্চল আর তাদের শাসনাধীন থাকেনি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চাংগামিরে নামে এক শক্তিশালী রাজ্য

গড়ে ওঠে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পর্তুগীজদের সঙ্গে চাংগামিরের যোগ ছিল অপ্রত্যক্ষ। মোনো মাতাপার অধীনস্ত অঞ্চলগুলির মেলার মাধ্যমে চাংগামিরে পর্তুগীজরা কারবার চালাত।

ভাকারাংগা ও চাংগামিরের মধ্যে বিরোধ পর্তুগীজদের নাক গলাবার সুযোগ এনে দিল। অবশ্য তার আগেই পর্তুগীজরা শনৈঃ শনৈঃ ভাকারাংগা রাজ্যের অভ্যন্তর-ভাগের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছিল। মোনো মাতাপার অধীনস্ত রাজ্যগুলিকে ভাকারাংগা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য উসকানি দিয়ে পর্তুগীজরা তাদের পথ পরিষ্কার করে। এরপর আরব ও সোয়াহিলি বণিকদের হটিয়ে দিয়ে তারা জামবেসির উজানে নদী বন্দর সেনা ও তেতে দখল করে। তেতে রাজধানী থেকে চার পাঁচ দিনের পথ। তেতে থেকে পর্তুগীজরা একজন পাদ্রিকে পাঠিয়ে দিল রাজার কাছে। উদ্দেশ্য রাজাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে সভ্য করে তোলা। রাজা সহজেই রাজী হয়ে গেলেন। পাদ্রী গোনজালো দি মিলভিয়েরা তাকে দীক্ষা দিলেন। কিন্তু রাজা দীক্ষা গ্রহণের পরেই তার মুসলমান উপদেষ্টাদের উসকানিতে ক্ষিপ্ত হয়ে পাদ্রীকে হত্যা করলেন। পিছনে কার চক্রান্ত ছিল জানা যায়নি, কিন্তু পর্তুগীজদের সামরিক অভিযান শুরু হতে বিলম্ব হলনা। সেই সুপরিচিত "পারা, পাদ্রী ও প্রহরণ" প্রেরণের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হল।

কিন্তু ব্যাপারটা সহজ ছিলনা। যুদ্ধ চলেছিল দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে। শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য চাংগামিরের দাপট সহ্য করতে না পেরে মোনো মাতাপা মাভুরা পর্তুগীজদের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে পর্তুগালের অধীনস্থ রাজা বলে ঘোষণা করলেন ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে। ফল কিছু ভাল হলনা। ভাকারাংগা রাজ্যের পতন রোধ করা গেলনা। এ রাজ্যের বড় অংশ চাংগামিরে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল এবং প্রবল শক্তিশালী চাংগামিরে রাজ ১৬৯৩ থেকে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে মোনো মাতাপা ও তার রক্ষক পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দিলেন উপকূল-ভাগের দিকে। প্রাচীন ভাকারাংগা রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হল একটি করদ রাজ্য। আফ্রিকার দু'টি স্বাধীন রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে পর্তুগীজদের দম ফুরিয়ে এসেছিল। তাই দীর্ঘকালে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা আর তারা করেনি।

পর্তুগাল আর কিছু না পারুক আফ্রিকায় প্রবেশের পথ দেখিয়েছিল। এবার সেই পথ ধরে আফ্রিকায় প্রবেশ করল আরও শক্তিশালী, আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ। সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষ্ণ আফ্রিকার ইতিহাস এই অনুপ্রবেশের ইতিহাস। সে ইতিহাস বণিক শক্তির ধনিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার ইতিহাস।

৩

"আমেরিকায় সোনা ও রূপা আবিষ্কার, আদিবাসী মানুষদের উৎখাত, দাসে পরিণত করা এবং খনিগুলির মধ্যে কবর দেওয়া, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (ইস্ট ইন্‌ডিজ) বিজয় ও লুণ্ঠনের স্বচনা, আফ্রিকাকে কৃষ্ণাঙ্গদের ব্যবসায় ভিত্তিক শিকারের বনভূমিতে পরিণত করা পুঁজিবাদী উৎপাদনের যুগের রক্তিম ঊষার স্বচনা করেছিল।"

'পুঁজি'—কার্ল মার্কস

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকেই স্পেন ও পর্তুগালের দম ফুরিয়ে এল। আমেরিকা ও এশিয়া তাদের বিশাল সাম্রাজ্য দেখতে দেখতে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ল। একদিকে ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের তীব্র প্রতিযোগিতা, আর একদিকে নিজেদের উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ স্পেন ও পর্তুগালকে আধুনিক ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য করল।

স্পেন ও পর্তুগালের পতনের মূল কারণ হল তার বণিক শ্রেণীর ব্যর্থতা। রাজা ও অভিজাত বর্গ বিলাসব্যসন ও যুদ্ধ বিগ্রহে বিপুল ঐশ্বর্য নষ্ট করলেন। বণিক-সম্প্রদায় নিজেদের সংহত করে ধনিক শক্তিতে পরিণত হতে পারল না। অন্যদিকে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের বণিক শ্রেণী নতুন নতুন আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলল আধুনিক শিল্প, উৎপাদন ও বাণিজ্য শতগুণ বেড়ে গেল। রাজশক্তির উৎসাহে ও সক্রিয় অংশগ্রহণে বণিকদের বড় বড় কোম্পানি স্থাপিত হল। ব্যবসা বাণিজ্যের ধারা একেবারে বদলে গেল।

এ সব ব্যাপারে নীতির কোন বালাই ছিল না। বোম্বেটেদের উৎসাহ দিতে রাণী এলিজাবেথ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। ব্রিটিশ জলদস্যুরা স্পেনের বাণিজ্যপোত আক্রমণ করে সোনারূপো লুণ্ঠন করত, স্পেনের উপকূলে হানা দিয়ে সবকিছু লুটে-পুটে নিয়ে আসত। জলদস্যুদের অধিনায়করা রাজসম্মান লাভ করত এবং জাতীয় বীর বলে গণ্য হত। এরাই পরে নৌবাহিনীর অধিনায়কদের পদ লাভ করেছিল।

ব্রিটিশ নৌবাহিনী ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের "দুর্জয় নৌবহর"কে বিধ্বস্ত করে মহা-সমুদ্রে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল। উৎকোচ ও উপঢৌকন দিয়ে ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাট ও রাজকর্মচারীদের তুষ্ট করে চতুর ইংরাজ বণিকরা পর্তুগীজদের হটিয়ে দিল। এরপর শুরু হল উপনিবেশ স্থাপন এবং অন্যান্য ইওরোপীয় শক্তির উপনিবেশ দখল করার পালা। এ ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে কোনো শক্তিই পাল্লা দিয়ে উঠতে পারল না।

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই ইংল্যাণ্ড উত্তর আমেরিকায় তার প্রথম উপনিবেশ 'ভার্জিনিয়া' স্থাপন করল। ধর্মীয় নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ লাভের, এবং বাধাহীনভাবে নতুন জীবন শুরু করার আশায় দলে দলে ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি ইওরোপের নানা জাতির মানুষ উপস্থিত হল 'নতুন মহাদেশে'। ইংরেজদের সংখ্যা-ই ছিল বেশি, ফলে উত্তর আমেরিকায় ইংল্যাণ্ডের বহু উপনিবেশ গড়ে উঠল। আফ্রিকার ভাগ্যাকাশে পর্তুগীজরা কালো মেঘের সঞ্চার করে যে দুর্যোগের সূচনা করেছিল এক শতাব্দীর মধ্যেই তা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল। ধনিকশ্রেণী যখন মাথা তুলেছে তখনও পশ্চিম ইওরোপে সামন্ততন্ত্রের দাপট কিছুমাত্র কমেনি। কিন্তু এখানে ওখানে কলকারখানা গড়ে উঠেছে, দেখা দিয়েছে নতুন দুই শ্রেণী—ধনিক ও শ্রমিক। বণিক, ধনী-কারিগর ও মহাজনরাই ধনিক শ্রেণীরূপে তাদের উপযোগী নতুন সমাজ গড়ে তুলতে অগ্রণী হয়েছে। জার্মাণীতে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রসার এবং ক্যাথলিক-প্রোটেস্টাণ্ট সংঘর্ষ, নেদারল্যাণ্ডস-এ স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং শেষপর্যন্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম হল্যাণ্ডের অভ্যুদয় সমগ্র ইয়োরোপে সামন্ততন্ত্রের পতনের সূচনা করল।

নেদারল্যাণ্ডস্-এর উত্তরাংশ অর্থাৎ হল্যাণ্ডেই ঘটল পৃথিবীর প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব। হল্যাণ্ডেই প্রথম ধনিকশ্রেণী ক্ষমতাসীন হয়ে তাদের দেশকে ব্যবসাবাণিজ্য ও নৌ-শক্তিতে ইওরোপের শীর্ষস্থানীয় দেশে পরিণত করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইওরোপের চেহারা বদলে গেল। ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ক্রমওয়েলের আবির্ভাব ও রাজা চার্লসের মৃত্যুদণ্ড এবং ধনিকশ্রেণী ও

সামন্ততন্ত্রী ভূম্যধিকারীদের মধ্যে আপসের ফলে তথাকথিত 'গৌরবময় বিপ্লব' ইল্যাণ্ডে ধনিকশ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল। ইয়োরোপে সংস্কৃতি ও নবজীবনের চেতনা অ-শ্বেতাঙ্গ মানুষদের মানুষ বলে গণ্য করতে সেখায়নি। তাই, উত্তর আমেরিকার আদিবাসীরা (রেড ইণ্ডিয়ানরা) উৎসাদিত বা দুরবর্তী অঞ্চলে বিতাড়িত হল এবং কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীত- দাসেরা ভারবাহী পশুর স্থান গ্রহণ করল।

উত্তর আমেরিকায় ইংরেজ ও অন্যান্য ইওরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপন ও দাস ব্যবসায়ের প্রসার পরস্পর সংযুক্ত একটি প্রক্রিয়া। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বসতি স্থাপনের জন্য বহু লোকের দরকার, শুধু ইয়োরোপীয়দের পক্ষে এই প্রয়োজন মেটানো সম্ভব ছিলনা। স্পেন ও পর্তুগাল আগেই পথ দেখিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডও বিনা দ্বিধায় সেই পথ অনুসরণ করে আফ্রিকা থেকে হাজার হাজার দাস আমদানি করতে শুরু করল।

ব্রিটিশ পুঁজিবাদের বিকাশে ক্রীতদাস প্রথা বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছিল। মার্কস লিখেছেন: "দাস-ব্যবসায় চালিয়ে লিভারপুল ফেঁপে উঠল। এই হল আদিম সঞ্চয়ের একটি পন্থা।"

ইংল্যাণ্ডের শক্তিশালী নৌবাহিনী ও বিরাট বাণিজ্যপোত বহরের সঙ্গে এঁটে ওঠার ক্ষমতা পর্তুগাল বা অন্য কোনো ইওরোপীয় শক্তির ছিলনা, ফলে আফ্রিকা থেকে দাস রপ্তানীর কারবার প্রায় পুরোপুরিভাবেই ইংল্যাণ্ডের করায়ত্ত হল।

উত্তর আমেরিকায় স্থাপিত ১৩টি উপনিবেশ ক্রমে ক্রমে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করতে চলল। ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্র বজায় থাকাসত্ত্বেও ধনিকশ্রেণী মাথা তুলতে লাগল। করভারে পীড়িত সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ বিপ্লবকে আসন্ন করে তুলল।

পশ্চিম ইয়োরোপে ধনিকশ্রেণীর অভ্যুদয় কালেই বিভিন্ন দেশেব ধনিকশ্রেণীর মধ্যে দেখা দিল তীব্র বিরোধ। পরস্পরে সঙ্গে প্রতিযোগিতা সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল অহরহ। উদীয়মান তিন ধনিক রাষ্ট্র—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের বিরোধ উঠল চরমে। আমেরিকা, ভারতবর্ষ, ইস্ট-ইণ্ডিজ (ইন্দোনেশিয়া), আফ্রিকা,—এককথায় প্রায় সারা দুনিয়া জুড়ে তিন দেশের মধ্যে চলতে লাগল লড়াই।

১৭৫৬-১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাযুদ্ধ। এই মহাযুদ্ধে শুধু ইয়োপের বিভিন্ন রাষ্ট্র জড়িয়ে পড়েনি, আমেরিকায় স্থাপিত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের উপনিবেশগুলিও জড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হয় এবং তার উপনিবেশ কানাডা ইংল্যাণ্ডের হাতে চলে যায়। ইংল্যাণ্ডের এই জয় শেষ পর্যন্ত উত্তর

আমেরিকায় তার বিপর্যয় ঘটিয়েছিল—তাকে হারাতে হয়েছিল উত্তর আমেরিকায় ১৩টি উপনিবেশকে।

এই ১৩টি উপনিবেশে যারা বসতি করেছিল তাদের বেশীর ভাগই ইংরেজ। অবশিষ্টরাও ছিল ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষ। ইয়ো-রোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং নবজাগ্রত জীবনের ঐতিহ্য তারা বহন করে এনেছিল। আমেরিকার উত্তরে স্থাপিত হয়েছে কলকারখানা, বন্দর নির্মাণ কেন্দ্র প্রভৃতি, দক্ষিণাংশে গড়ে উঠেছে বিরাট বিরাট তুলার বাগিচা এবং পশ্চিমাংশ পরিণত হয়েছে কৃষিপ্রধান অঞ্চলে। দক্ষিণাংশে তুলার বাগিচার জন্যই বহু ক্রীতদাসের প্রয়োজন হয় এবং এই প্রয়োজন মেটায় ইংল্যাণ্ডের দাস ব্যবসায়ীরা।

স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার সময় উত্তর আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশের লোক-সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ এদের মধ্যে ৫ লক্ষ হল কৃষ্ণাঙ্গ। ৫ লক্ষ নিগ্রোর মধ্যে মাত্র ৫০ হাজারের কিছু বেশী লোক স্বাধীনভাবে (কলকারখানার শ্রমিকরূপে বা অন্য কোনোভাবে) কাজ করতে পারত।

উত্তরাংশের শিল্পপ্রধান অঞ্চলে ৫৫ হাজার নিগ্রো প্রধানত গৃহভৃত্য, পরিচারক ইত্যাদির কাজ করত। কিন্তু দক্ষিণাংশে মেরিল্যাণ্ড থেকে জর্জিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস পশুর অধম জীবন যাপন করত। মনিবরা এদের নির্মমভাবে খাটিয়ে যথাসম্ভব বেশী মুনাফা অর্জন করতে চেষ্টা করত। এদের জীবনের কোনো মূল্য ছিলনা, এককথায় এদের মানুষ বলেই গণ্য করা হতনা।

একদিকে নির্ভেজাল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং অপরদিকে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত দাসপ্রথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ইতিহাসের গোড়ার দিকের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যার জের এখনও চলছে।

উপনিবেশবাসীদের মধ্যে রেষারেষি থাকলেও ব্রিটিশরাজের নিরঙ্কুশ আধিপত্য সমস্ত উপনিবেশেই তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ জাগিয়েছিল। আমেরিকায় সামন্ততন্ত্রের বালাই ছিলনা। কাজেই গোড়া থেকেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে এবং কঠোর বিধিনিষেধ সত্ত্বেও উপনিবেশগুলিতে, বিশেষ করে, উত্তরাংশে ধনিকশ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিধিনিষেধ, অধিবাসীদের দারিদ্র ও তাদের মতামত উপেক্ষা করে কর নির্ধারণ, ইংল্যাণ্ডের প্রজা বলে গণ্য হলেও উপনিবেশ-বাসীদের পার্লামেণ্টে কোনো প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি না থাকার ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল উদীয়মান মার্কিন ধনিক শ্রেণী তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে জন-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ চলাকালে ইংল্যাণ্ডকে বাধ্য হয়েই উপনিবেশবাসী-দের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাসীদের মধ্যে এক নতুন চেতনা ও আত্মবিশ্বাস জাগে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে গিয়ে তারা ব্রিটিশরাজের শোষণ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়বার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

ইংল্যাণ্ডের অনমনীয় মনোভাব ১৩টি উপনিবেশের সমস্ত শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং আমেরিকায় স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। ইংল্যাণ্ডে বস্ত্রশিল্প যত জেঁকে উঠতে থাকে তুলার চাহিদাও তত বাড়তে থাকে। আর এই তুলা সরবরাহ করে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণাংশের শ্বেতাঙ্গ বাগিচা মালিকরা প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাগিচা-মালিকদের প্রভাব নবগঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র দাসপ্রথা লোপের পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াল। স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করার পরেও স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক আমেরিকান রাষ্ট্রে ক্রীতদাস প্রথা অক্ষুণ্ণ রইল। একদিন চিনি শিল্পের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল হাজার হাজার ক্রীতদাসের, এখন তুলা চাষের জন্য ক্রীতদাসের প্রয়োজন বাড়ল বই কমল না।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যেখানে আমেরিকা মহাদেশে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার নিগ্রো দাস রপ্তানি করা হয় সেখানে সপ্তদশ শতাব্দীতে রপ্তানি করা হয় ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার দাস। তুলা বাগিচাগুলির দৌলতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আফ্রিকা থেকে রপ্তানি করা দাসের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার। উনবিংশ শতাব্দীতে দাস প্রথার আয়ু যখন ফুরিয়ে আসছে তখনও ১৯ লক্ষ দাস চালান দেওয়া হয়েছিল।

মার্কস বর্ণিত 'সঞ্চয়ের পন্থা' ইয়োরোপীয় বণিকের দল শনৈঃ শনৈঃ অনুসরণ করেছে। প্রথমে অজানা দেশ আবিষ্কার, পরে বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার এবং তারপর কোনো না কোনো অজুহাতে রাজশক্তির পূর্ণ সমর্থনে 'বণিকের মানদণ্ড'কে 'রাজদণ্ডে' পরিণত করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ।

(৪)

"এই সব জীবকে মানুষ বলে ধরে নেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কারণ এদের মানুষ বলে গণ্য করলে এই সন্দেহ জাগবে যে, আমরা নিজেরাই খৃষ্টান নহি।"

—মঁতাস্কু (আইনের মর্মবাণী : নিগ্রোদের দাসত্ব)

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী—এই দীর্ঘ চারশত বছর শুধু আফ্রিকা নয়, এশিয়া ও আমেরিকার কোনো মানুষকেই ইয়োরোপের উদীয়মান ধনিক শ্রেণী মানুষ বলে গণ্য করেনি। দাসপ্রথা পৃথিবীর সর্বত্রই তখন কমবেশী পরিমাণে বর্তমান ছিল, কিন্তু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এমন ব্যাপকভাবে দাস নিয়োগের ব্যবস্থা আর কোনো সময়েই দেখা যায়নি।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত পর্তুগাল আফ্রিকায় মানুষ শিকার ও তাদের দাসরূপে চালান দেওয়ার কারবারে একাধিপত্য বজায় রেখেছিল। দাস-ব্যবসায়ে বিপুল মুনাফা অর্জন করে পর্তুগাল ধনী হয়ে উঠেছে দেখে হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের বণিকরা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁরাও ব্যাপকভাবে দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত হলেন। নৌ-শক্তির জোরে এদের সকলকে হটিয়ে দিয়ে ইংল্যাণ্ড দাস-ব্যবসায়ে প্রায় একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করল।

ইংল্যাণ্ডের এক কুখ্যাত খুনী ও লুঠেরা দাস-ব্যবসায়ের মাহাত্ম্য প্রথম উপলব্ধি করেছিল। এর নাম হল জন হকিংস। তখন ইংল্যাণ্ডের রাজশক্তি তথা উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর কাছে এই শ্রেণীর লোক দেশপ্রেমিক বীর বলে গণ্য হত। কাজেই জন

হকিংস ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রীতিভাজন হয়ে অচিরেই 'স্যার' উপাধি লাভ করল এবং অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হল। এখন থেকে তাঁর নাম সসম্মানে উচ্চারিত হতে লাগল সারা দেশে।

আফ্রিকার মনুষ্য শিকারে এবং দাসরূপে তাদের দলে দলে চালান দেওয়ার ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তিনি দেশের ঐশ্বর্য এত বাড়িয়ে দিলেন যে, রাণী এলিজাবেথ নিজেই তার কারবারের অংশীদার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। স্যার জন হকিংসের দ্বিতীয় অভিযানে রাণী একটি জাহাজ ধার দিয়েছিলেন। জাহাজটির নাম হল **'যিশু'**।

১৫৬২-৬৩ সালে তার প্রথম মানুষ ধরার অভিযানে লণ্ডনের তার "সম্মানিত বন্ধুদের" পূর্ণ সমর্থন লাভ করে হকিংস তিনটি জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেন। গিণির উপকূলে সিয়েরা লিয়েনায় জাহাজ ভিড়িয়ে বেশ কিছুকাল সেখানে থাকেন। এই সময় তার লোকজন ৩০০ মানুষ ধরে। ৩০০ নিগ্রোর বিনিময়ে হকিংস যে পরিমাণ চিনি, চামড়া, আদা ও মুক্তা পান তাতে তার তিনটি জাহাজ ভরতি হয়ে যায় এবং মালবহনের জন্যে তাকে আরও দু'টো জাহাজ ভাড়া করতে হয়।

স্বভাবতই দাস-ব্যবসায়ে এই বিপুল মুনাফা সারা ইংল্যাণ্ডে সাড়া জাগিয়েছিল এবং শত শত ভাগ্যান্বেষী এই ব্যবসায়ে নেমে পড়েছিল।

আমেরিকা মহাদেশে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের অধিকৃত দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে ক্রীতদাস প্রথার প্রবর্তন এবং দাস-ব্যবসায় আফ্রিকার জীবনে ঘটিয়েছিল এক নিদারুণ বিপর্যয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা নিগ্রো মণীষী ড' ডব্লিউ, ই, বি, ডুবয় লিখেছেন: "এ হল একটি মহাদেশের উপর বলাৎকার, প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাসে যার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার।"

বন্য পশুর মত তাড়া করে নির্বিচারে আফ্রিকান নরনারী ও শিশুদের ধরা হত এবং তাদের উপর যে রকম নির্মম অত্যাচার করা হত জন্তু-জানোয়ারের উপরেও মানুষ সে রকম নির্মম অত্যাচার করেনা। এর ফলে পশ্চিম গোলার্ধে যেখানে একদল আফ্রিকান দাস আমদানি করা হত সেখানে মারা পড়ত পাঁচজন আফ্রিকান, জাহাজে তোলার আগেই মারপিটের চোটে অথবা জাহাজে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনায় এবং অর্ধাশনে, অনশনে।

ড' ডুবয়ের হিসাবে আফ্রিকা হারিয়েছিল প্রায় ছয় কোটি মানুষ। এই হিসাবই এখন মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। প্রতি ছয়জনের মধ্যে ৫ জন পথেই বা জাহাজে তোলার আগেই মারা পড়ত—এই হিসাব ঠিক হলে চারশত বছরে ৫ কোটি নিগ্রোর

মৃত্যু হয়েছিল। গিনির উপকূলের উত্তরভাগ অর্থাৎ আজকের গিনি প্রজাতন্ত্র, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া, আইভরি কোস্ট, ঘানা, টাগো, দাহোমে, নাইজেরিয়া—এই কয়টি অঞ্চল থেকেই আমেরিকা মহাদেশে সর্বাধিক সংখ্যক দাস রপ্তানি করা হয়েছিল।

রুশ গবেষক এস, আক্রামোভা তাঁর "গিনির উপকূলের উত্তরভাগে দাস ব্যবসায়ের ইতিহাস (১৫শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত)" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে কত দাস আমেরিকা মহাদেশে পাঠানো হয়েছিল তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব না হলেও নানা সূত্র থেকে মোটামুটিভাবে জানা যায় যে, ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে পর্তুগালে সর্বপ্রথম ১০ জন আফ্রিকানকে দাসরূপে চালান দেওয়া হয়েছিল এবং এরপর পঞ্চদশ শতাব্দীতে মোট ৩৬ হাজার, ১৬শ শতাব্দীতে ১৩ লক্ষ ৭৫ হাজার, ১৭শ শতাব্দীতে ২৮ লক্ষ (এর মধ্যে ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রপ্তানি করা হয় ১৮ লক্ষ দাস, বাকী দশ লক্ষ তার আগেই রপ্তানি করা হয়েছিল), ১৮১৮ শতাব্দী থেকে উনবিংশ :শতাব্দীর প্রথম দিক অর্থাৎ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৭৯ লক্ষ ৭৬ হাজার দাস রপ্তানি করা হয়।

দাস-শিকার কালে, চালান দেওয়ার সময় পথে এবং সংঘর্ষে যত আফ্রিকান মারা যায় সব ধরে পশ্চিম আফ্রিকা হারিয়েছিল ৫ কোটি থেকে ৫ কোটি ৫০ লক্ষের মত মানুষ।

রুশ গবেষকদের মতে দাস ব্যবসায়ের সমগ্র কালকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: (১) ১৫শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি—এ সময় অল্পসংখ্যক দাস চালান দেওয়া হয় (বছরে ৭০০ থেকে ৮০০)।

এ সময় প্রধানত স্পেন ও পর্তুগালে বাড়ির চাকরের বা ক্ষেতখামারের কাজের জন্যে দাসের প্রয়োজন হত।

ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন তার উপনিবেশগুলিতে বাগিচা স্থাপন করায় এবং সোনা-রূপার খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় দাসেদের চাহিদা বেড়ে যায় এবং বছরে ১০ হাজার দাস রপ্তানি করা হতে থাকে এ সময় স্পেন এবং পর্তুগাল দাস-ব্যবসায়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটেন, ও হল্যাণ্ড এবং আরও পরে ফ্রান্স, সুইডেন ও ডেনমার্ক দাস ব্যবসায়ে নেমে পড়ে।

(২) সপ্তদশ সতাব্দী—এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দাস-ব্যবসায় জেঁকে ওঠে। আটের দশক থেকে বছরে ৪০ হাজার দাস রপ্তানি হতে থাকে এবং ক্রমেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এর প্রধান কারণ হল আমেরিকা ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে বাগিচা সমূহের দ্রুত

প্রসার। এই সব অঞ্চল থেকেই তখন ইয়োরোপে কাঁচামাল রপ্তানি করা হত। ব্রিটেনে বুরজোয়ারা জয়যুক্ত হওয়ার পর এ ব্যবস্থাই পুঁজিবাদ গড়ে তোলার পথ সুগম করে।

এই সময় দাস-ব্যবসায় আন্তর্জাতিক ধাঁচ পরিগ্রহ করে। পশ্চিম ইয়োরোপের এমন কোনো দেশ ছিলনা যে দেশ এই লাভজনক ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করেনি। গিনি অঞ্চলের দুই পাউণ্ড দরে কেনা একজন দাসের দর ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে বারবাডোস দ্বীপে দাঁড়িয়েছিল ১৯ পাউণ্ডের বেশী। এইরকম মুনাফার গন্ধ পেয়ে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড আর আগে কখনও ঘটেনি।

আফ্রিকার ঘরে ঘরে যখন আর্তনাদ উঠছে, ভীতি-বিহ্বল মানুষের পলায়নের ফলে গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান হতে যাচ্ছে, তীর ধনুক আর বল্লমের সাহায্যে আফ্রিকানরা আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করছে তখন ইয়োরোপে পুঁজিবাদ রক্তশোষক জোঁকের মত স্ফীত হয়ে উঠেছে। দাস-ব্যবসায় তার কাছে ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ! তাই ইয়োরোপীয় পুঁজিবাদীদের ভগবান ভক্তির শেষ নেই, বাইবেল ছাড়া তাঁরা কথাই বলেন না।

ব্রিটিশ পুঁজিপতিরাই সবচেয়ে বেশি 'নাফা' করেছিলেন। একা ব্রিটেনই তার জাহাজ বছরে অন্য সব ইয়োরোপীয় দেশের জাহাজে যত দাস চালান দেওয়া হয় তার প্রায় চারগুণ বেশি দাস চালান দিয়েছিল।

এইভাবে ব্রিটিশ বণিকরা প্রচুর মুনাফা করে। সঞ্চিত পুঁজির পরিমাণ বিপুলভাবে বেড়ে যায় এবং এই পুঁজিই পুঁজিবাদী শিল্পের অভ্যুদয়ে সাহায্য করে। দাস চালান দেওয়ার জন্যে লিভারপুলে জাহাজ তৈরীর হিড়িক পড়ে যায়। ফলে জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্ররূপে লিভারপুল সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, আবার দাস ক্রয়ের জন্যে সুতী বস্ত্রাদির চাহিদা বাড়তে থাকায় ম্যানচেস্টার বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। তাই মার্কস বলেন: "আপনার তুলো নেই, আর তুলো না থাকলেও আপনার আধুনিক শিল্পও নেই। ক্রীতদাস প্রথাই উপনিবেশগুলির মূল্য নির্ধারণ করেছে। উপনিবেশগুলিই বিশ্ব-বাণিজ্য সৃষ্টি করেছে এবং বিশ্ব বাণিজ্যই হল বৃহদায়তন শিল্পের পূর্বশর্ত।"

ক্রীতদাস প্রথা ও দাস-ব্যবসায় হল পুঁজিবাদের 'পৌষমাস', কিন্তু আফ্রিকার সর্বনাশ। সর্বনাশ হল আফ্রিকার ক্রমে ক্রমে, অকস্মাৎ নয়। শ্বেতাঙ্গরা হানা দিয়ে ধরে নিয়ে যায় আফ্রিকান নরনারী, ছেলেমেয়েদের। আতঙ্ক প্রধানত উপকূলভাগে সীমাবদ্ধ রইল কিছুকাল। ইতিমধ্যে আফ্রিকানরা তাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রা

অনুসরণ করে চলল। তাঁতীরা তাঁত বুনছে, কর্মকাররা ধাতু গলিয়ে ধাতব তৈজসপত্র তৈরী করছে, চাষবাস চালিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু ধীরে ধীরে উপকূলভাগে জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে এল। তাঁতী নেই, কে তাঁত বুনবে ? কর্মকার নেই, কে তৈজসপত্র বানাবে ? এই অবস্থা ক্রমে সারা আফ্রিকা মহাদেশেই দেখা দিল। ১৬৫০ সালের পর আফ্রিকার মানুষ ছাড়া রপ্তানি করার আর কিছু রইল না। আর এই মানুষ রপ্তানি করতে গিয়ে আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলি তাদের নিজেদের পুঁজিই রপ্তানি করতে থাকল যে পুঁজি বাবদ কোনো সুদ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা অথবা যে পুঁজি রপ্তানি করে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের বিন্দুমাত্র আশা ছিলনা।

আফ্রিকান দাসেরা তাদের মনিবদের ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়ে তুলতে লাগল, কিন্তু সে ঐশ্বর্যের এক কণাও আফ্রিকা পেলনা। যে সব আফ্রিকান দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল এবং শ্বেতাঙ্গ বণিকদের হাতে আফ্রিকানদের তুলে দিল তারা বিনিময়ে পারিশ্রমিক পেত সন্দেহ নেই। কিন্তু সে পারিশ্রমিক হল ভোগ্য পণ্য, তা উৎপাদনে লাগানো যায়না। এই ধরনের বিনিময় পুঁজি সঞ্চয়ে সাহায্য করেনা, কাজেই আরও উন্নত অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো সম্ভবনাই ছিলনা। আফ্রিকান রাজ-রাজড়া ও বড় বড় বণিকরা আফ্রিকান দাসদের বিনিময়ে নিতেন অকিঞ্চিৎকর জিনিসপত্র অথবা অস্ত্রশস্ত্র। এই আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রই আফ্রিকার কাল হয়ে দাঁড়াল।

আধুনিক মারণাস্ত্র যারা যোগালো তারাই তাদের তৈরি আরও সাংঘাতিক মারণাস্ত্রের সাহায্যে আফ্রিকানদের পদানত করল। কিন্তু তার চেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হল এই যে এই আধুনিক মারণাস্ত্র হাতে পেয়ে আফ্রিকানরা আত্মহননের মহাতাণ্ডবে মেতে উঠল। মানুষ ধরে ইয়োরোপীয় বণিকদের কাছে বেচে অর্থসংগ্রহ বা অস্ত্রসংগ্রহ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলনা, কাজেই এক উপজাতি আর এক উপজাতির উপর, এক রাজ্য আর এক রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাতে লাগল। যারা পরাজিত হবে তাদের সকলেরই দাস জীবন অথবা নিছক মৃত্যুবরণ করতে হবে, তাই নিদারুণ কিন্তু অপরিহার্য বিকল্প ছিল অন্যদের দাসে পরিণত করা, আগ্নেয়াস্ত্র কেনার উদ্দেশ্যে—অথবা নিজের দাসে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি নেওয়া। এটাই ছিল প্রকৃতপক্ষে ইয়োরোপের সঙ্গে দাস-ব্যবসায়ের দেশের অন্তর্নিহিত চালিকাশক্তি। এ যে কি ভয়ঙ্কর শক্তি এবং কিভাবে তা দিনে দিনে বেড়ে উঠেছিল নীচের পরিসংখ্যান-গুলি থেকে তা উপলব্ধি করা যাবে।

১৮৪৭ সালে একজন শ্বেতাঙ্গ পাদ্রি আফ্রিকার উপকূলভাগে সার্থবাহ দলকে প্রায় এক হাজার বন্দুক নিয়ে যেতে দেখেন। এর কয়েক বছর পরে একটি ইউরোপীয়

প্রতিষ্ঠান বছরে ২০ হাজার বন্দুক বিক্রি করত বলে জানা যায়। ৭০ এর দশক পর্যন্ত প্রধানত গাঁদা বন্দুকই আফ্রিকান শাসক ও ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হত। এগুলি খুব মারাত্মক না হলেও কাজে লাগত, কারণ আওয়াজ হত দারুণ। এই আওয়াজেই সাধারণ লোক ভয় পেত, ধরাও দিত। ক্রমে প্রধানত জার্মানদের দৌলতে আরও মারাত্মক ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি হতে থাকে। একটি হিসাবে জানা যায় যে শুধু পূর্ব আফ্রিকাতেই ১৮৮৫ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে নানা ধরনের প্রায় দশ লক্ষ বন্দুক, ৪০ লক্ষাধিক পাউণ্ড বারুদ এবং বহু লক্ষ কার্তুজ রপ্তানি হয়। পশ্চিম আফ্রিকাতেও অনুরূপ পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিবারুদ রপ্তানি করা হয়। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা ভয় পেয়ে যায়। আফ্রিকানদের হাতে আধুনিক অস্ত্র তুলে দেওয়ার অর্থ প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়া। তারা আফ্রিকার অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ রপ্তানি বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়।

ইতিমধ্যে আধুনিক অস্ত্র আফ্রিকান সমাজে আরেকটা বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটায়। আফ্রিকানরা লক্ষ করেন যে যাদের শক্তিশালী রাজা আছে তারাই বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। এর ফলে কেন্দ্রিয় শক্তিরূপে রাজতন্ত্র গড়ে তোলার ঝোঁক পড়ে এবং এতদিন যারা বিচ্ছিন্ন এক একটি উপজাতি বা গোষ্ঠী রূপে মান্ধাতার আমলের জীবনযাত্রা অনুসরণ করে চলছিল তারা একত্র হতে থাকে। যেসব অঞ্চলে শক্তিশালী রাজতন্ত্র গড়ে উঠেছিল সেই অঞ্চল আরও সম্প্রসারিত হয়ে বেশ বড় বড় রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু আফ্রিকান সমাজের এই ক্রমবিবর্তন যখন তাকে মধ্যযুগে পৌঁছে দিল তখন পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়ে তার ভয়ঙ্কর থাবা বিস্তার করছে। সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী সংগঠন, আধুনিক মারণাস্ত্র এবং বিপুল শক্তির সামনে আফ্রিকানদের প্রতিরোধ টিঁকল না। এমনি করে দাস-ব্যবসায়ীরা শুধু আফ্রিকার মানুষই লুঠ করল না, আফ্রিকার উৎপাদিকা শক্তিগুলির বৃদ্ধি রোধ করে তার অগ্রগতি স্তব্ধ করে দিল। ওদিকে ইয়োরোপের শাসক শ্রেণী দ্রুত বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়ে উঠল, নতুন নতুন আবিষ্কার, নতুন নতুন কারিগরি-বিদ্যা ইউরোপের সামনে খুলে দিল নতুন দিগন্ত। আর আফ্রিকা? আফ্রিকার সমাজ পঙ্গু, স্থানু হয়ে গেল, সভ্যতার আদিম ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক স্তর ছাড়িয়ে আর সে উঠতে পারল না। পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী এই চারশত বছর আফ্রিকার বিচ্ছিন্নতা ও পক্ষাঘাতের বছর।

৫

“ধূলিঝড়েব মত এক খ্রীষ্টান বিপর্যয়
আমাদেব উপব নেমে এসেছে।
ব্যাপাবটাব শুরুতে ওবা এসেছিল শান্তিপূর্ণভাবে,
মৃদুস্বরে মিষ্ট কথা বলেছিল।

*　　　*　　　*

আমবা সকলেই কিছু ওদেব মতলব বুঝতে
পাবিনি,
তাই এখন আমবা ওদেব অধীন হয়েছি।
সামান্য দানে ওবা আমাদেব ভুলিয়েছে

—হাজি উমর (ঘানা)

আমেরিকা মহাদেশে যখন দাস-ব্যবসায় ফেঁপে উঠেছে এবং ইংরেজ বণিক ও দাস-ব্যবসায়ীরা দু'হাতে মুনাফা লুটছে, ঠিক তখনই ফরাসি বিপ্লবের বন্যা ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রের সব কিছু নিশ্চিহ্ন করে দিল। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবেব ঘাত প্রতিঘাতেব মধ্য দিয়ে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাব ধ্বজা তুলে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সেব ধনিকশ্রেণীই রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করল। ক্ষমতাসীন এই ধনিকশ্রেণীব প্রতিভূরূপে ইয়োরোপের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন নেপোলিয়ন।

সম্রাট নেপোলিয়নেব বিজয়োদ্ধত বাহিনী সারা ইয়োরোপে ঝড় তুলল। জার্মানি

ও ইতালির অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটিয়ে নেপোলিয়ন ধনতন্ত্রের জয়-যাত্রার পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। প্রায় সমগ্র ইয়োরোপ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পদানত হল।

কিন্তু জলদস্যুতা, দাস-ব্যবসায় এবং ভারত-লুণ্ঠন-লব্ধ বিপুল প্রাথমিক পুঁজি তখন ইংল্যাণ্ডকে প্রবল শক্তিতে পরিণত করেছে। তার বিরাট নৌবাহিনী সপ্তসাগর মথিত করে সারা পৃথিবীতে বিস্ময় ও আতঙ্ক জাগিয়েছে। ইয়োরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংল্যাণ্ড দুর্ধর্ষ ফ্রান্সকে প্রতিহত করল। মেটারনিকের নেতৃত্বে মধ্য ইয়োরোপে সামন্ততন্ত্রনির্ভর রাষ্ট্রগুলি আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। কিন্তু ধনতন্ত্রের অগ্রগতি রুদ্ধ করা গেলনা।

শিল্পবিপ্লবের পর ইংল্যাণ্ড নববলে বলীয়ান হয়ে উঠেছিল। ফ্রান্সের পরাজয়ের পর আর তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। আমেরিকার উপনিবেশগুলি হারালেও তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল পৃথিবীর সমস্ত অংশে।

১৭৮৩ থেকে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল এবং শীর্ষস্থানীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে দেখা দিল ব্রিটেন। এবার আদিম পুঁজি সঞ্চয়ের পালা শেষ হয়ে অবাধ বাণিজ্য ও সভ্যতা বিস্তারের পালা এল।

উৎপাদিত রাশি রাশি পণ্যের জন্যে বাজার চাই, পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্যে চাই রাশি রাশি কাঁচামাল। আফ্রিকা একটা মহাদেশ, অনেক রাজ্যও সেখানে আছে, কিন্তু সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হল এখান থেকে মানুষ ধরে আমেরিকায় চালান দেওয়া। এতে খরচ অনেক কম, লাভ অনেক বেশী। কাজেই দাস-ব্যবসায় বন্ধ করতে না পারলে স্বাভাবিকভাবে আফ্রিকায় বাণিজ্য বিস্তার করা সম্ভব নয়।

ইয়োরোপের খ্রীষ্টান ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি সভ্যতা বিস্তারের এবং অসংখ্য খৃষ্টানদের মানুষ করে তোলার উদ্দেশ্যে অনেক আগে থেকেই আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের সংগঠন গড়ে তুলেছিল। বেশীরভাগ প্রতিষ্ঠান দাস-ব্যবসায়ের অনুকূলেই প্রচার চালাতেন। শ্বেতাঙ্গদের দাস রূপেই কৃষ্ণাঙ্গরা স্বর্গে যাওয়ার অধিকার পাবে এই ছিল এইসব প্রতিষ্ঠানের মূল বক্তব্য। পোপ বা অপর কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যাতে এর বিরোধিতা করতে না পারেন তার জন্যে পর্তুগীজ শাসকরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় শক্তি আফ্রিকার দিকে নজর দেওয়ার পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। যে ব্রিটেন দাস-ব্যবসায়ে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল সেই ব্রিটেনেই ক্রীতদাস প্রথা ও দাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ তীব্র হয়ে উঠল। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন প্রোটেষ্টান্ট গীর্জার অনুগামীরা। তাঁদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উৎসাহ প্রবল হয়ে ওঠে এবং প্রোটেষ্টান্টদের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিশেষ করে এ্যাংলিক্যান চার্চ দাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৭৭২ সালে একটি ক্রীতদাস সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি লর্ড ম্যান্‌সফীল্ডের বিখ্যাত রায় দাস-ব্যবসায়ের অবসানের সূচনা করে। লর্ড ম্যান্‌সফীল্ড তাঁর রায়ে ঘোষণা করেন যে, ইংল্যাণ্ডের আইনে দাস-প্রথার কোন স্থান নেই।

প্রকৃতপক্ষে এই রায়ে শুধু সংখ্যালঘু কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বা মনোভাব নয়, তৎকালীন ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর প্রভাবশালী অংশেরই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশ উপলব্ধি করেছিলেন যে দাস-ব্যবসায় বজায় থাকলে স্বাভাবিকভাবে বাণিজ্য বিস্তার করা যাবেনা। তাঁরা দাস-ব্যবসায় বন্ধ করার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। ১৭৭২ সালের বিখ্যাত রায় তাঁদের পথ প্রশস্ত করল এবং ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকা নিষিদ্ধ করে আইন পাশ হল। ডেনমার্ক ইংল্যাণ্ডের সঙ্গেই দাস-ব্যবসায়ে নেমে পড়েছিল, কিন্তু ডেনমার্কে দাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ হয়ে যায় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে আইন পাশ হওয়ায় তিন বছর আগেই। কিন্তু ব্রিটেন ও ডেনমার্ক দাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ করলেও বে-আইনীভাবে দাস-ব্যবসায় চলতে থাকে। এর ফলে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত যেকোন লোকের কঠোর শাস্তি দানের বিধান দিয়ে এক আইন পাস করে। ব্রিটেন নিজে দাস-ব্যবসায় বে-আইনী ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হলনা, অন্যেরা যাতে এই ব্যবসায় চালাতে না পারে তার জন্যে সংশ্লিষ্ট সব দেশের উপর চাপ দিতে লাগল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে দাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ ঘোষিত হল, হল্যাণ্ডও ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যবসায়কে বে-আইনী ঘোষণা করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দাস-ব্যবসায় চলতে থাকল। ব্রিটেন তার নৌবাহিনীর সাহায্যে বে-আইনীভাবে দাস চালান দেওয়া বন্ধ করার জন্যে সক্রিয়ভাবে জাহাজে জাহাজে তল্লাসী চালিয়ে বহু নিগ্রো বন্দীকে উদ্ধার করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স এ ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করলেও খুব সক্রিয় ছিলনা। এর ফলে ব্রিটেন যে ব্যবস্থা অবলম্বন করল কৃষ্ণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে তার ফল হল দূরপ্রসারী।

কৃষ্ণ আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্যের রাজা, সামন্ত, সর্দার ও ধনী ব্যবসায়ীরা দাস-ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান হয়েছিলেন। এ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ও বিরোধ চলত এবং তা অনেক সময় সশস্ত্র সংঘর্ষ ও দেশ জয়ের অভিযানেও পরিণত

হত। এবার খাস কৃষ্ণ আফ্রিকায় দাস-ব্যবসায় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটেন সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। কৃষ্ণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে টহল দিতে লাগল ব্রিটিশ নৌবাহিনীর গানবোটগুলি। ভয় দেখিয়ে ও জোর করে কৃষ্ণ আফ্রিকার দাস-ব্যবসায় বন্ধ করার পরিণতি ঘটল উপনিবেশ স্থাপনে। তবে-এসব সত্ত্বেও যতদিন দাসের চাহিদা ছিল ততদিন পুরোপুরিভাবে দাস-ব্যবসায় বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের পরেও দাস-ব্যবসায় কমবেশী পরিমাণে অব্যাহত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে ব্রাজিল ও কিউবার ক্রীতদাস প্রথা লোপ করার পর আধুনিক যুগের কলঙ্কিত দাস-ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যায়।

ইয়োরোপের পাদ্রী ও ব্যবসায়ীরাই সর্বপ্রথম আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। অসভ্য কৃষ্ণাঙ্গদের সভ্য করে তোলা এবং সোনা, হাতির দাঁত, মসলা প্রভৃতি সংগ্রহ করে রপ্তানি করার কাজেই তাঁরা লিপ্ত ছিলেন। কিছু সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গদের ধরে তাদের দাসরূপে বিদেশে চালানও শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা দিতেন। তবু এ সময় পর্যন্ত আফ্রিকায় ইয়োরোপের দৃষ্টি তেমনভাবে পড়েনি। দাস-ব্যবসায় যখন খুব লাভজনক হয়ে উঠল তখনই ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ল আফ্রিকার উপর। এর আগে পর্যন্ত কৃষ্ণ আফ্রিকা ছিল আদি ইয়োরোপীয়দের কাছে এক রহস্যময় দেশ। নিবিড় অরণ্য, মহাকায় হস্তী, হিংস্র সিংহ, বিশাল কুমির, কুৎসিত দর্শন জলহস্তী, মহাবলশালী গোরিলা, সাজ্ঘাতিক গণ্ডার ও বন্য মহিষ, ভীতিপ্রদ অজগর, কত অজানা অদ্ভুত সব পশুপক্ষী, বামন থেকে দৈত্যাকার কৃষ্ণকায় মানুষ—সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত দেশ। এমন দেশে আধিপত্য বিস্তারের কথা তখন তারা ভাবতেও পারেনি। দাস-ব্যবসায়ে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠলেও বৃটেন তার নিজের স্বার্থেই দাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ করেছিল। আর এ কথা মানতেই হবে যে ব্রিটেন দাস-ব্যবসায় বন্ধ করার জন্যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে দাস-ব্যবসায়ে সহজে ভাঁটা পড়ত না।

ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব পুঁজিবাদের জয়যাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছিল, ব্রিটেনের অর্থনৈতিক কর্মনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। আফ্রিকা মহাদেশে বাণিজ্য-বিস্তার ও কাঁচা মাল সংগ্রহের অভিযান ব্রিটেনের এই নতুন অর্থনীতির অনিবার্য পরিণতি।

পর্তুগালের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড অনেক আগেই কৃষ্ণ-আফ্রিকার উপকূলে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। এখন এইসব ঘাঁটি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়ে গেল।

আফ্রিকায় সাম্রাজ্য স্থাপনের অভিযান প্রথম শুরু করেছিল ফ্রান্স। উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকায় ক্রমে ক্রমে আলজেরিয়া, মরক্কো ও তিউনিসিয়া দখল করে ফ্রান্স কৃষ্ণ আফ্রিকার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল। অবশ্য অনেক আগেই ফ্রান্স কৃষ্ণ আফ্রিকার সেনেগাল দখল করে সুদানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

ব্রিটেনও চুপ করে বসেছিল না। সিয়েরা লিওন বা সিংহভূমিতে ঘাঁটি স্থাপন করে ক্রমে ক্রমে সে হাত বাড়িয়েছিল অভ্যন্তরভাগে, যার ফলে সমগ্র সিয়েরা লিওন ও নাইজেরিয়া তার কুক্ষিগত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত বুয়ররা কিছুকাল পরেই আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরূপে রাজ্যবিস্তারে নেমে পড়লে ব্রিটেনও সেখানে হাজির হয়।

সভ্যতা বিস্তার, দাসপ্রথা লোপ এবং বাণিজ্য বিস্তারের নামেই ইয়োরোপের উদীয়মান ধনিক রাষ্ট্রগুলি কৃষ্ণ আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করতে শুরু করে।

প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাই এ সময় প্রবলতম শক্তিরূপে কাজ করে। রবার ও অন্যান্য কাঁচা মালের চহিদা বেড়ে চলেছে, আর এসব জিনিস আফ্রিকা থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব। কলকারখানার প্রসার ঘটায় তেল-কালির উপদ্রব বেড়েছে, তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্যে সাবানের দরকার, আর সাবান তৈরীর জন্যে চাই পামতেল। অতএব আফ্রিকার বাণিজ্য বিস্তার করতেই হবে। তাই কৃষ্ণ-আফ্রিকা সম্পর্কে আগ্রহ ক্রমেই বাড়তে থাকল। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আবিষ্কারকেরা বেড়িয়ে পড়লেন কৃষ্ণ আফ্রিকার যবনিকা উত্তোলনের উদ্দেশ্যে।

এ সময় স্বাভাবিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে কৃষ্ণ আফ্রিকায় গড়ে উঠেছিল নতুন নতুন শক্তিশালী রাষ্ট্র, কোন কোন অঞ্চলে জাতিসত্তার উদ্ভব হচ্ছিল। প্রথম দিকে কৃষ্ণ আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রেখেই ইয়োরোপীয়রা ব্যবসা বাণিজ্য বেশ ভালভাবেই চালিয়েছিলেন। ইয়োরোপীয় রাজশক্তিগুলি কৃষ্ণ-আফ্রিকার অধিপতিদের সমান মর্যাদা দিয়েই তাঁদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কৃষ্ণ আফ্রিকার পাম তেলের কারবার জমে উঠল। উপকূলভাগের যে অঞ্চল থেকে পাম তেল রপ্তানী হত সে অঞ্চল তৈল উপকূল নামে খ্যাতি লাভ করল। ব্রিটেন ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে দশ হাজার টন পাম তেল কিনেছিল ১৮৪২ ও ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের পামতেল আমদানির পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০ হাজার ও ৪০ হাজার টন। তেলের করবার লাভজনক দেখে 'দাস উপকূল' নামে পরিচিত দাহোমের উপকূলভাগ এবং স্বর্ণ উপকূল ও অন্যান্য অঞ্চলের ব্যবসায়ীরাও তৈল রপ্তানি করতে শুরু করে।

শুধু পামতেল নয় চীনা বাদামের কারবারও দিনে দিনে বাড়তে থাকে। সেনেগালের চাষীরা প্রথম দিকে ফ্রান্সে কয়েক টন করে বাদাম রপ্তানি করে। পরে ৯০-এর দশকে চীনাবাদাম রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে গড়ে ৬৮ হাজার টন।

ব্রিটিশ প্রযুক্তিবিদরা পামফলের শাঁস থেকে মারগারিন তৈরীর উপায় উদ্ভাবন করার পর আফ্রিকা থেকে পাম শাঁসের রপ্তানি বাড়তে থাকে। পামতেল যে নদীপথে উপকূলভাগে চালান যেত, সেই নদীর নতুন নামকরণ হয়েছিল 'তৈল নদী'! এই নদীপথে ৮০-র দশকের শেষদিকে পাম শাঁস রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে ৫০ হাজার টনেরও বেশী।

স্বর্ণ উপকূলে পামতেল রপ্তানি ও সুতীবস্ত্র আমদানির পরিমাণ ১৮৬২-৭২ সালের মধ্যে চারগুণ বৃদ্ধি পায়।

কৃষ্ণ আফ্রিকায় ইয়োরোপীয় দেশগুলি থেকে বিশেষ করে ব্রিটেন থেকে সুতী বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যের রপ্তানিও ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

যেসব ইয়োরোপীয় পাদ্রী সভ্যতা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলেন তাঁরা চাষীদের কোকো প্রভৃতি নানা ধরনের নতুন কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে শিখিয়েছিলেন। এসব পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানিও ক্রমে বাড়তে থাকে।

এইভাবে বাণিজ্যের মাধ্যমে কৃষ্ণ আফ্রিকায় এক নতুন সমাজের ভিত্তি গড়ে ওঠার সূচনা হয়। এ সময় কৃষ্ণ আফ্রিকায় যেসব রাজ্য বা সাম্রাজ্য ছিল বা স্থাপিত হয়েছিল সেই রাজ্য বা সাম্রাজ্যের নৃপতি বা সম্রাট ও তাঁদের আমলারা ব্যবসা বাণিজ্য বেশ ভালভাবেই চালিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা ইয়োয়োপীয় বাণিজ্যের সমকক্ষ হয়ে ওঠেন। ব্যবসা বাণিজ্য এ সময় আজকের ভাষায় যাকে বলে 'রাষ্ট্রায়ত্ত' তাই দিল। নৃপতি বা সম্রাটরা ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্যকে বিশেষ প্রশ্রয় দিতেন না, কারণ রাষ্ট্রের তথা নিজেদের লাভ লোকসানের উপর তাঁরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন।

বস্ত্রশিল্পে কৃষ্ণ আফ্রিকার সাফল্যও লক্ষ করার মত। হাউজা ভূমির (উত্তর-নাইজেরিয়া) উৎকৃষ্ট বস্ত্রের খ্যাতি সারা আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, আজকের পাউণ্ডের হিসাবে তখন হাউজা ভূমিতে প্রতি বছর ৪০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্রাদি উৎপাদিত হত। লোহা ও ইস্পাতের জিনস তৈরীর ক্ষেত্রেও কৃষ্ণ আফ্রিকার থেকে কোন কোন অঞ্চলের মানুষ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। কৃষি ও গবাদি পশু পালনের ক্ষেত্রে কৃষ্ণ আফ্রিকার অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। এক কথায় বলা যায় যে—, কৃষ্ণ আফ্রিকার অধিবাসীদের অনগ্রসরতা

অথবা আধুনিক জীবনের সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে চলার অক্ষমতার যে ধারণা ইয়োরোপীয়রা পোষণ করতেন সে ধারণার কোন ভিত্তি নেই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের বাঙলা দেশের মুৎসুদ্দি-বানিয়ানদের মত কৃষ্ণ আফ্রিকায় বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে উপকূলভাগে বেশ শক্তিশালী একটি দেশীয় বণিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্য প্রধানত রাষ্ট্রায়ত্ত থাকায় এই শ্রেণী খুব প্রসার লাভ করতে পারেনি, তবু এই শ্রেণীর ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা কম ছিলনা। স্বাভাবিক ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে হয়তো নবজাত এই শ্রেণী ধনিক-শ্রেণীতে পরিণত হতে পারত।

কৃষ্ণ আফ্রিকায় এ সময় একটা সর্বব্যাপী পরিবর্তনের লক্ষণ বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই পরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে গেল ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের ফলে।

কৃষ্ণ আফ্রিকার সম্পদের প্রতি তখন ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছে। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে আধিপত্য বিস্তারের বাসনা জাগতে শুরু করেছে ইয়োরোপীয় ধনিকশ্রেণীগুলির মনে।

এবার থাবা মারার পালা শুরু হল। কৃষ্ণ আফ্রিকা তথা সমগ্র আফ্রিকায় ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মনে ভূখণ্ড অধিকার ও উপনিবেশ স্থাপনের বাসনা জাগ্রত হয়েছিল প্রধানত চারটি কারণে :

১) আফ্রিকায় ইয়োরোপীয় বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীআফ্রিকান সরকার বা নৃপতিদের ক্ষমতা চূর্ণ করা ;

২) ইয়োরোপীয় ধনিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা ;

৩) উদীয়মান বৃহৎ পুঁজিপতিদের ধাতুশিল্পে লগ্নী করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা ;

এবং ৪) ইয়োরোপে পর্যুদস্ত বা দুর্বল শক্তিগুলির আফ্রিকার ভূখণ্ড দখল করে ক্ষতিপূরণ করার বা সম্পদ লাভের বাসনা।

পুঁজিবাদ এ সময়ে দ্রুত তার শেষ ও চরম স্তর সাম্রাজ্যবাদের দিকে এগিয়ে চলেছে। ইয়োরোপে শ্রমিকবিক্ষোভ শুরু হয়েছে এবং ধনিকশ্রেণীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিয়েছে শ্রমিকশ্রেণী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে বেকার-সমস্যা। সর্বহারা হাজার হাজার মানুষ চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ। বেপরোয়া বহু লোক নানা অপরাধে লিপ্ত, সমগ্র সমাজে দেখা দিয়েছে অশান্তি।

এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের একটি পথই তখন ধনিকশ্রেণীর কাছে খোলা ছিল। সে পথ হল অনধিকৃত দেশগুলিকে দখল করা। ধীরে ধীরে ধনিকশ্রেণী

এই পথেই অগ্রসর হল। কিভাবে হল তার দু' একটি দৃষ্টান্ত দিলেই চলবে।

১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল পরিক্রমাকালে পর্তুগীজ নাবাধ্যক্ষ পেদ্রো দি সিনত্রা আতলান্তিক মহাসাগরের দিকে প্রসারিত এক ভূখণ্ডে চমৎকার একটি প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেখানে অরণ্যাবৃত ২৫ মাইল দীর্ঘ ও ২৫০০ থেকে ৩০০০ ফুট উঁচু গিরিশ্রেণীর "মেঘ ও কুয়াশায় ঢাকা শীর্ষ দেশে বজ্রের প্রচণ্ড গর্জন" শুনে পেদ্রো দি সিনত্রার নাবিকরা নবাবিষ্কৃত জায়গাটির নাম রেখেছিল 'সিয়েরা লিওন' অর্থাৎ সিংহ পর্বত।

এই সিয়েরা লিওনে প্রথম যে দুইজন ইংরেজ পদার্পণ করেন তাঁরা হলেন কুখ্যাত জলদস্যু এবং তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের জাতীয় বীর স্যার ফ্রানসিস ড্রেক ও স্যার জন-হকিন্স। জন হকিন্স এখানে ঘাঁটি স্থাপন করে মানুষ শিকার ও দাসব্যবসার মাধ্যমে বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হন।

দাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ হওয়ার পর ইংল্যাণ্ডের এক জাহাজের ডাক্তার হেনরী স্মিথহ্যাম ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সিয়েরা লিওনে মুক্ত ক্রীতদাসদের বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। সরকারের সোৎসাহ সমর্থনে সেণ্ট-জর্জ বে কোম্পানি নামে এক কোম্পানি গঠিত হয়। কোম্পানির কাজ হল মুক্ত ক্রীতদাসদের একটি বসতি গড়ে তোলা এবং কারখানা, গুদামঘর প্রভৃতি স্থাপন করা।

সিয়েরা লিওন উপদ্বীপে জমি সংগ্রহ করে কোম্পানি কাজ শুরু করল। চার শত মুক্ত ক্রীতদাস নতুন জীবন আরম্ভ করার আশায় কোম্পানির কাছে আবেদন জানান। ব্রিটিশ সরকার অর্থ যোগালেন, জাহাজ যোগালেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বড় দিন এল। সেই দিন মুক্ত ক্রীতদাসদের প্রথম দলটি নিয়ে জাহাজ রওনা হল সিয়েরা লিওনের দিকে। 'মদ, গাদা বন্দুক ও বাহারী কোটে'র বিনিময়ে সিয়েরা লিওনের রাজা ও তেমনে উপজাতির সর্দার নাইসবানা নতুন বাসিন্দাদের জন্যে জমি দিলেন।

এবার শুরু হল খ্রীষ্টধর্ম প্রচার, সভ্যতা বিস্তার ও বাণিজ্য একই সঙ্গে। প্রথম দিকে বিশেষ সুবিধে হলনা। কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা গোড়া থেকেই ব্যাপারটিকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল, কাজেই তাদের সহযোগিতা পাওয়া গেলনা। এর উপর রোগ-ব্যাধি অব্যবস্থার ফলে, অনাহার ইত্যাদির ফলে অনেক লোক মারা গেল, অনেকে পালিয়ে গেল।

কিন্তু বণিক ও মানব দরদীরা হাল ছাড়লেন না। এবার সিয়েরা লিওন কোম্পানি নামে এক নতুন কোম্পানি গঠিত হল, মুক্ত ক্রীতদাসদের নতুন নতুন দল এসে পৌছল। ফ্রান্সের সঙ্গে বিরোধ এবং ফরাসি বাহিনীর আক্রমণ সত্ত্বেও কোম্পানির

কারবার বেশ জমে উঠল কয়েক বছরের মধ্যে।

উপনিবেশ বিস্তারের ব্রিটিশ পদ্ধতি সিয়েরা লিওনের রাজা টমের (ছোট) পছন্দ হয়নি। তিনি ১৬ হাজার সৈন্য নিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানির উপনিবেশ আক্রমণ করলেন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। লড়াই চলেছিল বিক্ষিপ্তভাবে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের সনদ লাভ করলেও শেষপর্যন্ত উপনিবেশের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হয়ে পড়ল। এবার ব্রিটিশ সরকার এগিয়ে এসে উপনিবেশের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, সিয়েরা লিওনে স্থাপিত উপনিবেশ ফ্রী টাউন খাস ব্রিটিশ রাজের উপনিবেশে (ক্রাউন কলোনি) পরিণত হল। ইতিমধ্যে দাসপ্রথা লোপ করা হয়েছিল। উপকূলভাগে বেআইনী দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত জাহাজ ধরার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ নৌবহরের ঘাঁটি স্থাপন করা হলো। এরপর নানা অজুহাতে উপনিবেশ সম্প্রসারণের কাজে আর কোনো বাধা রইল না। তেমনে উপজাতির সর্দাররা সমগ্র সিয়েরা লিওন উপদ্বীপ ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন।

ব্রিটিশ সরকার বেআইনী দাস-ব্যবসারে লিপ্ত বিভিন্ন জাতির মালিকদের জাহাজগুলি থেকে ৭০ হাজার দাসকে মুক্ত করে সিয়েরা লিওনে বসতি করালেন।

ফ্রান্স ব্রিটেনের কাছে তার যে সাম্রাজ্য হারিয়েছিল তাব জায়গায় নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিল উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকায়। দাসব্যবসায় বন্ধ করার ব্যাপারে ফ্রান্সের খুব উৎসাহ ছিলনা, কাজেই পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল-ভাগে তার উপনিবেশ স্থাপনের গতি ছিল মন্থর। অনেক আগেই সেনেগাল দখল করে ফ্রান্স পশ্চিম আফ্রিকায় ঘাঁটি স্থাপন করলেও সমগ্র সেনেগাল অধিত্যকা দখলের অভিযান শুরু হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নবনিযুক্ত লাট সাহেব ল্যুই ফেদহাবেবের নেতৃত্বে। আলজিরিয়া অধিকার ও শাসনের অভিজ্ঞতা সেনেগালের নবনিযুক্ত গভর্নরকে দ্রুত উপনিবেশ বিস্তারে উৎসাহিত করেছিল।

সেনেগাল অধিত্যকাকে লাভজনক করে তোলার উদ্দেশ্যে ল্যুই ফেদহারবে নিগ্রো চাষীদের চীনা-বাদাম চাষ করতে বাধ্য করেন। চীনা বাদামের কারবার ফ্রান্সের পক্ষে বেশ লাভজনক হয়ে ওঠে।

সেনেগাল থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে ফ্রান্সই প্রথম আফ্রিকান-বাহিনী গঠন করে। 'মাছের তেলে মাছ ভাজার' এই কর্মনীতি ব্রিটেন ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় শক্তি অনুসরণ করেছিল। সেনেগালী সৈন্যদের সাহায্যে ফ্রান্স ইসলাম ধর্মাবলম্বী শক্তিশালী ফুলানি উপজাতির বিজয় অভিযান প্রতিহত করে। ফ্রান্সের উপনিবেশ ও বাণিজ্য বিস্তার শেষ পর্যন্ত পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলবর্তী বিশাল গিনি

সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

ব্রিটেনের দেখাদেখি ফ্রান্সও পশ্চিম আফ্রিকার গাবোনে লিবেরভিল নামে একটি বসতি গড়ে তুলেছিল ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সেখানে মুক্ত ক্রীতদাসেরা খুব বেশী সংখ্যায় বসতি স্থাপন করতে পারেনি। কারণ ফ্রান্স দাস-ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জাহাজ ধরার ব্যাপারে, বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি। এ ছাড়া এ সময় উত্তর আফ্রিকার দিকেই ফ্রান্সের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় কৃষ্ণ আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারে তার বিশেষ আগ্রহ ছিলনা।

কৃষ্ণ আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে সবচেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করেছিল ক্ষুদ্র বেলজিয়াম। প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার উপনিবেশ থেকে বেলজিয়ামের বিপুল মুনাফাই ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গকে কৃষ্ণ আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারে উৎসাহিত করে।

বেলজিয়ামের উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনীর সঙ্গে লিভিংষ্টোনের কৃষ্ণ আফ্রিকা আবিষ্কারের কাহিনী অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

দাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ করার পর শুধু ইংলণ্ডের অধীনস্থ দেশগুলিতে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষ করে আফ্রিকায় আরব ও নিগ্রো দায়-ব্যবসায়ীদের সায়েস্তা করার এবং "অন্ধকার মহাদেশে" খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করার জন্যে ইংরেজরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ধর্মপ্রচারের নামে বেরিয়ে পড়লেন লিভিংষ্টোন ও আরও অনেকে আফ্রিকা আবিষ্কারের অভিযানে। এঁদের সাহস, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা করতেই হবে। এই প্রথম এঁদের চেষ্টায় আফ্রিকার সঙ্গে ইয়োরোপের মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটল। অভিযাত্রীদের আবিষ্কার ব্যবসায় ও সামরিক অভিযানের পথ খুলে দিল। আফ্রিকার ভৌগোলিক অবস্থান, নদ-নদী, অরণ্য, বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল এবং অন্যান্য অনেক মূল্যবান সম্পদের খবর এঁরা সংগ্রহ করে ইয়োরোপের পুঁজিপতিদের ও সাধারণ মানুষকে তাক লাগিয়ে দিলেন।

দেশ আবিষ্কার ও ধর্মপ্রচারে ব্রতী ডেভিড লিভিংষ্টোন (১৮১৩—১৮৭৩) হঠাৎ একদিন "নিরুদ্দেশ" হলেন। তখন এই স্কচ্ পাদ্রীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন সাংবাদিক হেনরী ষ্ট্যানলি (১৮৪১—১৯০৪)। লিভিংষ্টোনের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর ফলাও করে প্রচার করে নিউ ইয়র্কের একটি সংবাদপত্র ষ্ট্যানলিকে আফ্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। ষ্ট্যানলি অনেক ঘুরে লিভিংষ্টোনকে খুঁজে বের করেন, তবে লিভিংষ্টোনের আয়ু তখন ফুড়িয়ে এসেছে। সাংবাদিক ষ্ট্যানলি তাঁর আফ্রিকা ভ্রমণের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েই আফ্রিকায় পদার্পণ করেছিলেন, কাজেই তিনি লিভিংষ্টোনকে খুঁজে বের করেই ক্ষান্ত হলেন না। ট্যাঙ্গানাইকা ও

ভিকটোরিয়া হ্রদ পরিক্রমা করে এবং কংগো নদের উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত পাড়ি দিয়ে তিনি আফ্রিকার বিরাট অঞ্চল সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করলেন। তার "থ্, দ্য ডার্ক কন্টিনেন্ট" বা "অন্ধকার মহাদেশ ভ্রমণ" সারা ইয়োরোপ ও আমেরিকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। অসংখ্য সংস্করণ হলো তাঁর এই গ্রন্থের।

স্ট্যানলি খুব করিৎকর্মা পুরুষ ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী মন নিয়েই তিনি আফ্রিকা সফরে বেরিয়েছিলেন। এতবড় দেশ, এত সম্পদ, ক্রীতদাসের মত অসংখ্য কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে খাটিয়ে বিপুল মুনাফা অর্জনের এমন সুযোগ—এ তো ছেড়ে দেওয়া যায়না! শেষপর্যন্ত তিনি বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডকে (১৮৬৫-১৯০৯) পাকড়াও করলেন। লিওপোল্ড ছিলেন ঝানু ব্যবসায়ী এবং স্বভাবতই কোন নীতির বালাই তাঁর ছিলনা। স্ট্যানলির কাছে কংগোর বিস্তৃত অঞ্চলে রবার চাষের সুবিধা আছে জেনে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তখনই তিনি এক প্রাইভেট কোম্পানি খাড়া করলেন। নিজেই এই কোম্পানির প্রধান অংশীদার এবং সভাপতি হয়ে রাজা লিওপোল্ড ছলে বলে কৌশলে কংগোর সরল আফ্রিকান সর্দারদের কাছ থেকে বাগিয়ে নিলেন বিশাল ভূখণ্ড। তারপর এই বিশাল ভূখণ্ডকে নিজস্ব রাজ্যে (নাম দেওয়া হয় 'কংগো ফ্রী স্টেট') পরিণত করে লিওপোল্ড সর্বময় কর্তা হয়ে বসলেন এবং এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অর্থাৎ ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের অনুমোদন আদায় করে নিতেও তাঁর কোন অসুবিধা হলনা। বেলজিয়ামের মত ক্ষুদ্র অথচ সমৃদ্ধিশালী দেশ এইভাবেই ঔপনিবেশিক শক্তিরূপে আফ্রিকার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল।

রাজা লিওপোল্ড প্রচুর লগ্নী করেছিলেন, মুনাফাও লুটেছিলেন অসম্ভব পরিমাণে। তাঁর এই সাফল্যই শেষপর্যন্ত বেলজিয়ামে ও অন্যান্য দেশের ধনিকশ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল কংগোর দিকে। আফ্রিকানদের উপর অত্যাচার, তাদের ক্রীত-দাসের মত খাটিয়ে রবার সংগ্রহ ইত্যাদি নানা কেলেঙ্কারী উদঘাটিত হওয়ায় খুব হৈচৈ শুরু হল। ১৯০৮ সালে জনমতের চাপে রাজা লিওপোল্ড তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানা ত্যাগ করে 'কংগো ফ্রী স্টেট'কে বেলজিয়াম রাষ্ট্রীয় উপনিবেশে রূপান্তরিত করতে রাজী হলেন। অবশ্য তার এই 'ত্যাগ স্বীকারে'র জন্যে তিনি মোটা ক্ষতিপূরণও আদায় করে নিলেন। বেলজিয়ামে জনমত গড়ে তুলেছিলেন বেলজিয়ামের ধনিক গোষ্ঠী। সরকার তাঁদেরই হাতে। অতএব রাজা লিওপোল্ড-এর প্রস্তাব সংসদে সহজেই গৃহীত হল। এর ফলে বেলজিয়াম এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হল, যার আয়তন তার চেয়ে ৮০ গুণ বড়।

কংগোর বিরাট বিরাট রবার গাছের জঙ্গল ছিল। এই সব জঙ্গল থেকে প্রতি

বছর আফ্রিকানদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রবার সংগ্রহ করে দেওয়ার হুকুম জারী করা হয়। হুকুম তামিল না করলে কঠিন শাস্তির বিধান করা হত। কোন গ্রামের অধিবাসীরা যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ রবার সংগ্রহ করে না দিত বা না পারত তা হলে পিটুনি ফৌজ পাঠিয়ে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচাব করা হত। নির্মম অত্যাচারের ফলে কংগোর দুই কোটি অধিবাসীর মধ্যে উণবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মাত্র ৮০ কি ৯০ লক্ষ কোনরকমে বেঁচে ছিল।

বেলজিয়ামের বিশাল উপনিবেশ ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের লোভ ও হিংসা জাগাল। ফ্রান্স ও পর্তুগাল কংগোতে তাদেরও দাবি আছে বলে কংগোর বাকি অঞ্চলগুলি দখলের জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। ফ্রান্স কংগোর বিস্তীর্ণ একটি অংশ দখল করে বসল। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের ধনিকশ্রেণী চুপ করে বসে থাকেন নি। তাঁরাও তাঁদের লোক পাঠিয়ে দিলেন আফ্রিকায়। দেশীয় সর্দারদের ঠকিয়ে হাজার হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গায় তাঁরা নির্বিবাদে দখলীস্বত্ব কায়েম করলেন। ছলে-বলে-কৌশলে অধিকৃত সমস্ত অঞ্চলকে বৈধভাবে অধিকৃত অঞ্চল বলে স্বীকার করে নেওয়া হল ১৮৮৪-৮৫ সালের ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের বার্লিন সম্মেলনে।

এই সময় পর্তুগালের পুরাতন সাম্রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা আবার তীব্র হয়ে উঠেছিল। সে অনায়াসেই তার উপকূলভাগে স্থাপিত পুরাতন ঘাঁটিগুলিকে সম্প্রসারিত করে একদিকে আংগোলা এবং অন্যদিকে মোজাম্বিক বা পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকা নামে দুই বিরাট উপনিবেশ স্থাপন করল। কিন্তু ফ্রান্স বাগড়া দেওয়ায় আংগোলা ও মোজাম্বিকের মধ্যে যোগ স্থাপনের বাসনা তার পূর্ণ হলনা।

লিভিংস্টোন ও স্ট্যানলির আফ্রিকা আবিষ্কারের সুযোগ গ্রহণ কবে বেলজিয়াম যে বিবাট উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং রবাব ব্যবসা থেকে বিপুল মুনাফা অর্জন করে যেভাবে ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছিল তাতে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মনে তীব্র অসূয়া জেগে ওঠে। ফ্রান্স কংগোর একাংশ দাবি করে, পর্তুগালও ফ্রান্সের ভয়ে তার উপনিবেশগুলিকে সংহত করতে সচেষ্ট হয়। এ সময় ঐক্যবদ্ধ জার্মানিতেও 'বিশ্ব-বাজনীতিবোধ' অর্থাৎ বাইরে বাজার খোঁজা ও উপনিবেশ বিস্তারের বাসনা জাগ্রত হয়। বিখ্যাত দেশ আবিষ্কারক কার্ল পিটার্স (১৮৫৬-১৯১৮) ব্রিটেনের উপনিবেশ স্থাপনের গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করে জার্মানিকে উপনিবেশ বিস্তারে উদ্বুদ্ধ করায় কৃষ্ণ আফ্রিকায় আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়োরোপীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটে। জার্মান সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় ঘটতে বিলম্ব হয়েছিল, তাই কার্ল পিটার্সের নেতৃত্বে জার্মানরা যখন আফ্রিকায় তাদের হাত বাড়াল তখন ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম

তাদের সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে বহাল তবিয়তে আফ্রিকানদের শোষণ করে চলেছে। কাজেই জার্মানরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ হাসিল করতে উদ্যোগী হল।

বার্লিন সম্মেলন যখন চলছে ঠিক তখনই জার্মানরা অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশ স্থাপন করতে থাকে। এখানেও সেই শঠতা ও প্রবঞ্চনার একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। এল পাদ্রী, ব্যবসায়ী এবং তারপর ফৌজ। রেইনিশ মিশনের একজন পাদ্রী নামা উপজাতির প্রধান জোসেফ ফ্রেডারকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে লুদেরিৎস নামক একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে দুটি চুক্তি করালেন। চুক্তি অনুযায়ী এই ব্যবসায়ী আঙ্গরা পেকুয়েনা উপসাগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং ২০০ মাইল দীর্ঘ উপকূলবর্তী ভূখণ্ডের দখল পেলেন। চুক্তিতে এই ভূখণ্ড "২০ মাইল চওড়া" বলে উল্লেখ করা হয়। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝেছিল এ মাইল তাদের মাইল অর্থাৎ ব্রিটিশ মাইলের ৪½ মাইল। আফ্রিকান সামন্ত বুঝেছিলেন এ মাইল ইংরেজদের মাইল। পরে জার্মানদের ব্যাখ্যা শুনে আফ্রিকান সামন্ত জোসেফ হতবাক হয়ে গেলেন। তৎকালীন জার্মান কমিশনার গোয়েরিং (নাৎসী নেতা গোয়েরিং-এর পিতা) জার্মান সরকারের কাছে পাঠানো তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন যে ··"চুক্তির বয়ান অনুযায়ী তারা তাদের প্রায় সমগ্র দেশ বিকিয়ে দিয়েছে" এ কথা শুনে তারা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। গোয়েরিং সাহেব, অবশ্য, যা করার তাই করলেন অর্থাৎ নামাদের জন্মভূমির প্রায় সবটাই দখল করে নিলেন।

এর পরেই হেরেরো উপজাতির পালা এল। তারা কোন চুক্তি করেনি, বিপদে পড়ে কিছু সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু "সভ্য" শ্বেতাঙ্গ বনিকদের আশ্চর্য নীতিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিলনা। তাই, শেষ পর্যন্ত তারাও পস্তাল। তাদের গরু-বাছুর মরছিল সংক্রামক রোগে। গোমড়কে প্রায় নিঃস্ব হয়ে গিয়ে জার্মানদের কাছ থেকে নেওয়া জিনিসপত্রের দাম তারা শোধ করতে পারল না। বাধ্য হয়ে বিক্রি করতে হল জমি। জলের দামে জমি কিনে নিল জার্মানরা। আফ্রিকানরা দরদামের কিছু বুঝত না। এর ফলে জার্মানিরা আধ মার্ক বা তার চেয়ে কম অর্থের বিনিময়ে ৬ বিঘারও বেশী জমি কিনতে শুরু করল। অষ্টাদশ শতকের ৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে গোমড়ক দেখা দেয় হেরেরোদের অঞ্চলে এবং ১৯০৪ সালের মধ্যে জার্মানরা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে উর্বর জমি সহ ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার জমির মালিক হয়ে বসে। এখানেই শেষ হলনা; ছলে-বলে-কৌশলে জার্মানরা আফ্রিকানদের হাজার হাজার গবাদি পশুও হাতিয়ে নিল।

দুঃখ-দুর্দশার শেষসীমায় পৌঁছে হেরেরোরা অস্ত্রধারণ করল। স্যামুয়েল মা

হেরেরোর নেতৃত্বে তারা লড়াই চালাল প্রায় এক বছর ধরে। যখন তারা হার মানলো তখন বীভৎস উপায়ে তাদের প্রায় সবংশে নিধন করা হল। একেই বলা হয় গণহত্যা। হেরেরো বাহিনীকে সপরিবারে ও অবশিষ্ট সমস্ত হেরেরো নরনারী ও শিশুকে জোর করে তাডিয়ে নিয়ে যাওয়া হল জলহীন প্রান্তরে। হাজার হাজার মানুষ ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ল সেই ভয়াবহ প্রান্তরের রুক্ষ ভূমির উপর —তারপর মৃত্যুই এনে দিল শান্তি। মাত্র ১২ শত মানুষ প্রাণে বেঁচে ব্রিটিশ বেচুয়ানা-ল্যাণ্ডে প্রবেশ করতে পেরেছিল। অল্পসংখ্যক লোক জার্মান অবরোধ ভেদ করে জার্মানদেরই অধিকৃত অঞ্চলে ঢুকেছিল, তাদেব কপালে জুঠেছিল বন্দীত্ব।

নাসারাও আর না পেবে অস্ত্রধাবণ কবেছিল এবং প্রচণ্ড লড়াই চালিয়েছিল তিন বছর ধরে। এদেরও কাযত উৎসাদন করেছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা। সরকারি হিসাবে দেখা যায় যে ১৯১১ সালে ৮০ হাজার হেরেবোব অবশিষ্ট ছিল মাত্র ১৫,১৩০ জন এবং ২০ হাজাব নাসাব মধ্যে মাত্র ৯,৭৮১ জন।

বার্লিন সম্মেলন শেষ হওয়ার আগেই জার্মানি কৃষ্ণ আফ্রিকায় তার উপনিবেশ স্থাপনের কাজ নির্বিঘ্নে শেষ কবে ফেলল।

বার্লিন সম্মেলনে বেলজিযামের রাজার 'কংগো ফ্রী স্টেট'কে মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইয়োরোপীয শক্তিব অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে তাদের আধিপত্য মেনে নেওয়া হল।

বার্লিন সম্মেলনে অনেক বড বড কথা বলা হয়েছিল, দাসপ্রথার নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ কবা হয়েছিল, অবাধ বাণিজ্যেব জযগান গাওয়া হয়েছিল। আসলে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের এই সম্মেলন আপসে আফ্রিকায় বিভিন্ন শক্তির অধিকৃত অঞ্চলগুলি মেনে নিয়ে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল যে দৃঢভাবে নিজ নিজ অধিকার কায়েম না [illegible] যেন কেউ নতুন নতুন অভিযানে নেমে না পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে বার্লিন সম্মেলন হল আফ্রিকা ভাগাভাগির পূর্বাভাস মাত্র।

বার্লিন সম্মেলনের আসল চেহারা উদঘাটিত কবে উইলিয়ম মরিস "কমনওয়েলথ" পত্রিকায় লেখেন:

"জনসাধারণকে লুণ্ঠন করা ও ফাঁদে ফেলা; বাজে মাল চালার বাজার সৃষ্টি করা; পুঁজি লগ্নী করার মত জমি দখল করা—এই সব করাই হল আধুনিক রাষ্ট্রনায়কত্বের একমাত্র লক্ষ্য। এই জন্যেই ফ্রান্সের শেয়ার বাজারের কারবারীদের প্রজাতন্ত্র পর পর টিউনিস, মাদাগাস্কার, টংকিন ও চীনে যুদ্ধ চালিয়েছে; এই জন্যেই লুটের মাল ভাগ বাঁটোয়ারার উদ্দেশ্যে বার্লিনে সম্মেলন বসেছে।"

৬

"ওদের খেল আমার জানা আছে। প্রথমে ব্যবসায়ী ও পাদ্রীরা: তাবপর রাষ্ট্র দূতেরা: তারপব কামান। সোজা কামানের সম্মুখীন হওয়াই ভাল।"

.—ইথিওপিয়াব সম্রাট দ্বিতীয় টিওডোবোস

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ বাহিনীব কাছে পবাজিত হওয়ার কিছুকাল আগে হাবসি সম্রাট যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীব ৭০-এর দশক বা তার আগেই সমগ্র কৃষ্ণ আফ্রিকা সে সত্য উপলব্ধি কবেছিল।

হাবসি সম্রাট আত্মমৃত্যু বরণ কবেছিলেন, আত্মসমর্পন করেন নি। কৃষ্ণ আফ্রিকাতেও ইয়োরোপীয় বাহিনীকে এমন একাধিকবার সম্রাট, রাজা বা সামন্তেব সম্মুখীন হতে হয়েছে। এঁদেব মধ্যে বেশ কয়েকজনেব সৌর্যবীর্য, সংগঠন শক্তি ও বণনৈপুণ্য ইয়োবোপীয় সেনাপতিদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে।

কৃষ্ণ আফ্রিকাব শাসকদেব বাজনীতি ও কূটনীতিব জ্ঞান বেশ ভালই ছিল। তাঁরা ইয়োবোপীয় রাজাদের সঙ্গে সমান মর্যাদায় বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন কবে এবং আপস আলোচনাব মাধ্যমে সমস্ত প্রশ্নেব মীমাংসা কবতে প্রস্তুত থেকে বিরোধ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের সাধ্যমত। বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে এ-ও তাঁরা বুঝেছিলেন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ইয়োরোপের নীতিবোধ এবং তাঁদের অর্থাৎ ইয়োরোপীয় মান অনুসারে "অসভ্য" কৃষ্ণাঙ্গদেব নীতিবোধের মধ্যে যে আসমান-জমিন ফারাক ছিল তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি। তাই শেষপর্যন্ত তাঁদের অনেককেই

হাবসী সম্রাটের পর আত্মসমর্পণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। আজকের ঐতিহাসিকদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে বিনা প্রতিরোধে কৃষ্ণ আফ্রিকা আত্মসমর্পণ করেনি।

কৃষ্ণ আফ্রিকার 'স্বর্ণ উপকূল' আগে বিশাল আশান্তে রাজ্যের রাজা ও-সেই বোনসু (রাজত্বকাল ১৮০৪-১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ) রাজ্যশাসনে রীতিমত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর সামরিক শক্তিও উপেক্ষণীয় ছিলনা। স্বর্ণ উপকূলের প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর স্যার কার্লস ম্যাকার্থীর চোখে তিনি অবশ্য 'বর্বর' রূপেই প্রতিভাত হন।

উপকূলবর্তী প্রদেশগুলির সামন্ত শাসকদের হাতে করে ব্রিটিশ বণিকরা আশান্তের রাজশক্তিকে দুর্বল করার যে চেষ্টা করেছিল তা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে ও-সেই বোনসু ব্রিটিশ বণিকদের প্রতিনিধিদের রাজধানীতে ডেকে এনে তাদের সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ বণিকরা দেবে আগ্নেয়াস্ত্র ও বারুদ, নেবে সোনা ও হাতির দাঁত। ও-সেই বোনসুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল, ব্রিটিশ বণিকদের সঙ্গে কারবার বেশ জমে উঠেছিল কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই অবস্থা পালটে গেল।

উপকূলভাগের সমস্ত দুর্গ ও বাণিজ্য ঘাঁটিগুলির দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকার নিজের হাতে নিলেন ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম লাট সাহেব এসেই বর্বর নৃপতিকে শিক্ষা দানের জন্যে সামরিক অভিযান শুরু করলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হলো।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করার পর আবার নতুন করে চুক্তি সম্পাদিত হলো এবং স্বভাবতই এবার আশান্তে সরকারকে অনেক কিছু ছাড়তে হলো। নতুন চুক্তির বিরুদ্ধে আশান্তে রাজ্যের সমর্থকদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে উপকূলভাগের সামন্ত-নৃপতিদের সায়েস্তা করার জন্যে সেনাপতি টিনের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। ব্রিটিশ সাহায্যপুষ্ট সামন্ত নৃপতিদের সায়েস্তা করার আগেই আশান্তে বাহিনীতে বসন্ত ও আমাশয় মহামারী আকারে দেখা দিল। সেনাপতি টিন যুদ্ধ স্থগিত রাখার জন্যে রাজার কাছে আবেদন জানালেন, কিন্তু রাজা রাজী হলেন না। আসলে রাজা যুদ্ধে নামতে চাননি, সামন্তদের চাপেই তিনি সৈন্যবাহিনী পাঠাতে বাধ্য হন। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, যাঁরা যুদ্ধ চেয়েছিলেন তাঁরা যুদ্ধ করুন, এখন যুদ্ধ থামানো হবেনা। সেনাপতি টিন তখন নিজেই উদ্যোগী হয়ে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে আপসের চেষ্টা করেন।

বিরোধী পক্ষ আসলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, তাই তিনি তাদের জানালেন যে লড়াই

তাদের বিরুদ্ধে নয়, উপকূলবর্তী চারটি সামন্ত রাজ্যের বিরুদ্ধে। এইসব সামন্ত রাজ্য আশানৃতে রাজের প্রতি আনুগত্য জানালে বিরোধ মিটে যাবে। ব্রিটিশ সেনাপতি তখন আক্রমণ চালাতে দৃঢ়সংকল্প কাজেই যুদ্ধ চলল।

প্রচণ্ড প্রতিরোধে হতবাক ব্রিটিশ সেনাপতি স্বীকার করলেন যে, এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ তিনি আগে আর কখনও দেখেননি। ব্রিটিশ বাহিনী কোনোক্রমে বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে রাজধানী কুমাসিতে পৌঁছল বটে, কিন্তু সেখানে তখন কেউ নেই। গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি অনুসরণ করে আশানৃতে সরকার রাজধানী ত্যাগ করে দূরে সরে গেছেন। ক্রুদ্ধ ব্রিটিশ সেনাপতি আগুন লাগিয়ে দিলেন রাজধানীতে, কিন্তু ভস্মীভূত রাজধানী তাঁকে ত্যাগ করতে হল। আশানৃতে সরকার আবার ফিরে এসে নতুন করে রাজধানী গড়ে তুললেন। আবার শুরু হল যুগপৎ আপস রক্ষা ও প্রতিরোধের পালা।

স্বল্প পরিসরে ও স্বল্পকালের জন্যে হলেও কৃষ্ণ আফ্রিকার এই যুদ্ধে নেপোলিয়ানের মস্কো অভিযানেরই পুনরভিনয় হয়েছিল সন্দেহ নেই। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আশানৃতে নৃপতিকে বাগে আনতে পারেননি।

ফ্রান্সকেও লিপ্ত হতে হয়েছিল দীর্ঘকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে। ফ্রান্স সেনেগাল থেকে সুদানের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছিল। কিন্তু তার সব চেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল গিনি উপকূলের দিকে আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী অল-হাজী উমর বিন-সৈয়দ। উত্তর সেনেগালের তুকোলোর উপজাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই পণ্ডিত ও যোদ্ধা ভেঙে পড়া মালি সাম্রাজ্যের কাঠামোর উপর নতুন সাম্রাজ্যের কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এর ফলে প্রথমে তাঁকে প্রবল পরাক্রান্ত ফুলানি সাম্রাজ্যের সঙ্গে লড়তে হয়েছিল। ফুলানিরাও উপকূলভাগের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। উমরের দুর্ধর্ষ বাহিনী তাদের পথরোধ করল। উমর ছোট বড় অনেকগুলি রাজ্য অধিকার করে শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। ঠিক এই সময়েই-ফ্রান্সের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধল।

উদীয়মান সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি উমরের জানা ছিলনা, তাই ফরাসীদের বণিক-রূপে গ্রহণ করেই বিরোধের নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রস্তাব করলেন যে সেনেগালের উপকূলভাগে তাঁকে আমদানি করা আগ্নেয়াস্ত্রের কার-বারের একচেটিয়া অধিকার দিতে হবে এবং এর পরিবর্তে তিনি ফরাসি বণিকদের অবাধে চলা-ফেরা ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর অধিকার দেবেন। কিন্তু ফরাসি কর্তৃপক্ষ তাঁর কথায় কান দিলেন না ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজের সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে উমর নিহত হন। দাহোমে রাজ্যের (বর্তমান বেনিন) শেষ রাজার বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ

এবং স্বেচ্ছাচার ধনিক শক্তির চাতুরীর ফলে তাঁর শোকাবহ পরিণতির কাহিনীও স্মরণীয়।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সে এই দুই শক্তিই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আফ্রিকার দাহোমে রাজ্য দখলের জন্তে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিল। ব্রিটেন চেয়েছিল ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাজাকে হাত করতে, ফ্রান্স চেয়েছিল সরাসরি অস্ত্রবলে দাহোমে দখল করতে। বেহানজিন তখন দাহোমের রাজা। ইংরেজদের উপহার একটি মোটর-গাড়ি পেয়ে রাজা খুব খুশী হয়েছিলেন, তবে 'ঘোড়াহীন গাড়ি'টা যে তাঁকে হাত করে তাঁর রাজ্য দখলের প্রচেষ্টা, তা তিনি বুঝতে পারেন নি। ধনিক শক্তির কুটিল প্যাঁচ সরল আফ্রিকান রাজার মনে কোনো সন্দেহ জাগায় নি।

এদিকে ফ্রান্সের তর সইল না। ব্রিটেনের আগেই কাজ হাসিল করার উদ্দেশ্তে ফ্রান্স দাহোমে আক্রমণ করল। কিন্তু "সভ্য" ফরাসিদের "বর্বর" কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হল। রাজা চাইলেন ফরাসি রাজার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর এই সরলতার চূড়ান্ত প্রতিদান পেতে তাঁর বিলম্ব হলনা। ফরাসি রক্ষীরা সসম্মানে রাজা বেহানজিনকে তাদের রাজার কাছে নিয়ে যাবার ছলে নিয়ে গেল আলজেরিয়ায়, তারপর সেখান থেকে বন্দী বেহানজিনকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ক্যারিবিয়ান সাগরে ফরাসি অধিকৃত মার্তিনিক দ্বীপে। সেখানে ১৯০৬ সালে রাজা বেহানজিনের মৃত্যু হয়। আজও তিনি বেঁচে আছেন দেশের মানুষের মনে প্রতিরোধের প্রতীকরূপে। এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে তাঁর পুত্র সেগুরাজ আহমাদু পিতার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। পিতার মতো পুত্রও ফরাসিদের সঙ্গে আপস করার চেষ্টা করেন, কিন্তু আপসের চেষ্টা ব্যর্থ হল। আহমাদুকে অস্ত্রধারণ করতে হল। দীর্ঘকাল ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আহমেদুকে নতিস্বীকার করতে হল। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের সেনাপতিরা ও সৈন্যদল অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়। গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করা হয়। একজন ফরাসি পর্যবেক্ষক এই অমানুষিকতাকে পদোন্নতি-প্রার্থী ফরাসি অফিসারদের 'উন্মত্ততা' বলে অভিহিত করেছেন। সারা ফ্রান্সে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল।

নাইজার অঞ্চলের নবগঠিত রাষ্ট্রের নৃপতি আলমেনি সামোরি তুরেও ফরাসিদের সঙ্গে আপসের ব্যর্থ চেষ্টা করে অস্ত্রধারণ করেন। ও-সেই বোনসুর মত সামোরি তুরেও ছিলেন একজন প্রগতিশীল নৃপতি। তাঁর অনুসৃত বিভিন্ন কর্মনীতি আজ গবেষকদের বিস্মিত করছে।

দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সামোরি পরাজয় বরণ করেন।

কৃষ্ণ আফ্রিকায় প্রতিরোধ-সংগ্রাম চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানদের জবরদস্তি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জকব মোরেংগার নেতৃত্বে নানা উপজাতি সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। মোরেংগার বিস্ময়কর সংগঠন ক্ষমতা ও রণচাতুর্য জার্মানদের হতবাক করে দিয়েছিল। জার্মান সেনানী-মণ্ডলীর সদস্য ক্যাপটেন বায়ের মোরেংগার রণনৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন যে, "মোরেংগার চাতুর্যপূর্ণ আকস্মিক আক্রমণ এবং সর্বোপরি তার অনুগামীদের উপর তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবের মাধ্যমে সে যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করেছিল এবং আমাদের অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করেছিল।" ক্যাপটেন বায়ের অকপটভাবে মোরেংগার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন যে, মোটের উপর মোরেংগা "একজন অসাধারণ যোদ্ধা এবং শত্রুরূপে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়ে আমরা পারিনা।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় উনবিংশ শতাব্দীতে যুগপৎ বুয়র ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জুলু জাতির প্রচণ্ড প্রতিরোধও ভোলবার নয়। দুর্ধর্ষ জুলু যোদ্ধাদের কাছে ব্রিটিশ বাহিনীর পরাজয়ই বুয়রদের উৎসাহিত করেছিল এবং মাজুবায় তাদের জয় ব্রিটিশ সরকারকে তাঁদের কর্মনীতি বদলাতে বাধ্য করে।

এইসব প্রতিরোধ-সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি। কৃষ্ণ আফ্রিকায় পরবর্তীকালে এই প্রতিরোধ সংগ্রাম নানা রূপ পরিগ্রহ করতে করতে শেষপর্যন্ত আধুনিক প্রতিরোধ-সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

৭

"সাম্রাজ্যবাদ হলো শিল্পের বাঘা বাঘা মালিকদের, তাদের যেসব মাল ও পুঁজি তারা নিজেদের দেশে বিক্রি করতে বা ব্যবহার করতে পারেনা সেইসব মাল ও পুঁজির জন্যে বিদেশী বাজার ও বিদেশে লগ্নীর সন্ধান করে তাদের বাড়তি ঐশ্বর্যের স্রোত বয়ে যাওয়ার খাত প্রশস্ত করার চেষ্টা।"

"প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আফ্রিকার ভূখণ্ড ভাগাভাগি ও ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কুক্ষিগত করার প্রথম পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছিল আবিষ্কারকদের সহযোগিতায় অথবা তাদের নিজেদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা অথবা পুঁজিবাদী কোম্পানিগুলি। আবিষ্কারক বা প্রতিনিধিদের কার্যক্রম ছিল সাধারণত উপকূলভাগ থেকে অভ্যন্তরভাগে কিছুদূর অগ্রসর হওয়া এবং বস্ত্র বা মদ উপহার দিয়ে সর্দার বা রাজাদের জয়েণ্ট-স্টক *কোম্পানিগুলির সঙ্গে তথাকথিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দিতে প্রলুব্ধ করা। ঐসব* আফ্রিকান শাসকদের স্বাক্ষর ছিল একটি চিহ্ন এবং এর দ্বারাই সন্ধিপত্র অনুসারে শাসকরা সামান্য কয়েক গজ কাপড় বা কয়েক বোতল জিনের বিনিময়ে নিজেদের সমগ্র ভূখণ্ডই কোম্পানিগুলিকে দিয়ে দিতেন। প্রায় সমগ্র মধ্য আফ্রিকার যেসব ভূখণ্ড ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির দখলে রয়েছে সেগুলির ভিত্তি হলো এইরকম সব দলিল।

...২০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সমগ্র মধ্য আফ্রিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, পর্তুগাল ও ইতালির মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছে ও তাদের কুক্ষিগত হয়েছে।"

—সাম্রাজ্যবাদ : জে, এ, হবসন

আধুনিক পুঁজিবাদের চেহারা যখন ইয়োরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছে ধরা পড়েছে তখন তার উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা ও লোভ সারা পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন সম্মেলনের পর আফ্রিকা ভাগাভাগির জন্যে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। দেখতে দেখতে আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) ও লাইবেরিয়া ছাড়া সমগ্র আফ্রিকা ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে গেল প্রায় শান্তিপূর্ণভাবেই।

লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৭)' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে পৃথিবী ভাগ বাঁটোয়ারা সংক্রান্ত অধ্যায়ে ভৌগলিক এ, সুপানের 'ইয়োরোপীয় উপনিবেশগুলির ভূখণ্ডগত বিস্তার' নামক গ্রন্থ থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আফ্রিকা মহাদেশের ৯০·০৪ শতাংশ ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ) কুক্ষিগত হয়েছে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আফ্রিকার উপনিবেশ স্থাপনের হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭৬ শতাংশ।

সুপানের সিদ্ধান্ত হলো। অতএব এই কালের বৈশিষ্ট্য হলো আফ্রিকা ও পলিনেশিয়া ভাগ-বাঁটোয়ারা।

লেনিন মন্তব্য করেছেন যে, সুপানের সিদ্ধান্তকে সম্প্রসারিত করে বলতে হবে যে, "এই কালের বৈশিষ্ট্য হলো পৃথিবীর চূড়ান্ত ভাগ-বাঁটোয়ারা—অবশ্য নতুন ভাগ-বাঁটোয়ারা অসম্ভব এই অর্থে নয়, বরং নতুন করে ভাগ-বাঁটোয়ারা হওয়া সম্ভব ও অনিবার্য…।"

প্রথম মহাযুদ্ধে লেনিনের সিদ্ধান্ত অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছিল।

আফ্রিকা ভাগাভাগিতে সিংহভাগ পেয়েছিল ব্রিটেন। ব্রিটেনের পরেই ফ্রান্স। জার্মানি রঙ্গমঞ্চে অনেক বিলম্বে আবির্ভূত হলেও বেশ কিছুটা জায়গা দখল করে নিতে পেরেছিল। অন্যান্য শক্তির দেখাদেখি পর্তুগালও এ সময় তৎপর হয়ে ওঠে এবং আংগোলা ও মোজাম্বিকে (পর্তুগীজ পূর্বআফ্রিকা) দুই বিরাট উপনিবেশ স্থাপন করে। এ ছাড়া ভারদে অন্তরিপ, পর্তুগীজ গিনি প্রভৃতি বেশ কয়েকটি অঞ্চল আগে থেকেই তার দখলে ছিল। বেলজিয়াম তো তার বিশাল কংগো রাজ্যে সকলের আগেই পাকাপোক্তভাবে ঘাঁটি গেড়েছিল।

ইতালিও নিষ্ক্রিয় হয়ে এই উপনিবেশ স্থাপনের খেলা দেখতে রাজী হলোনা। সে হাত বাড়ালো পূর্ব আফ্রিকার উপকূলভাগের দিকে। মূল লক্ষ্য ছিল ইথিওপিয়া। ইতালির অভিযান ইথিওপিয়া গোড়া থেকেই সন্দেহের চোখে দেখেছিল।

ফ্রান্সও ইতালির অভিযান রুখবার জন্যে ইথিওপিয়াকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে দ্বিধা করল না। ইথিওপিয়া ও আবিসিনিয়া প্রস্তুত হয়ে রইল। প্রাথমিক সাফল্যে ইতালির উৎসাহ বেড়ে গেল। সোমালিল্যাণ্ড স্থানীয় সুলতানদের কাছ থেকে সহজেই হাতানো গিয়েছিল, কিন্তু গোলযোগ বাঁধল লোহিত সাগরের মাসোওয়া বন্দর দিয়ে এরিত্রিয়া অভিযানকালে। এবার আবিসিনিয়া ইতালিকে বাধা দিল। কয়েকটি ছোটখাট যুদ্ধে জিতে ইতালি যখন সাহস্কারে অবিসিনিয়া দখলের উদ্যোগ করছে তখন আদোয়ার যুদ্ধে (১৮৮৫) আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ইতালির বাহিনীকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হলো। এই পরাজয়ের গ্লানি ইতালিকে দীর্ঘকাল বহন করতে হয়েছে। ১৯১১-১২ সালে তুরস্ককে যুদ্ধে হারিয়ে ত্রিপলি ও সাইরেনাইকা (পরে লিবিয়া নামে পরিচিত) অধিকার করেও ইতালির সাম্রাজ্যবাদীরা হাবসীদের কাছে পরাজিত হওয়ার অপমানের জ্বালা ভুলতে পারেনি অবশ্য ইতালির পার্লামেন্টে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মানাসিনি আদোয়ার যুদ্ধে ইতালির পরাজয়কে সামান্য একটি বিপর্যয় বলে উড়িয়ে দিয়ে গুরুগম্ভীর ভাষায় জানান যে, ইউরোপের বড়ো বড়ো শক্তিগুলি যখন আফ্রিকার জনগণকে সভ্য করার মহৎ কাজে নেমে পড়েছে তখন ইতালি নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকবে এতো হতে পারেনা।

হৃতগৌরব স্পেনও এক সময় থাবা মেরে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলবর্তী দুটি অঞ্চল—রিও দি আরো ও রিও মুনি কেড়ে নিল।

আয়তনের দিক থেকে ফ্রান্সই আফ্রিকার সর্বাধিক পরিমাণ জায়গা দখল করেছিল বটে, কিন্তু সব চেয়ে ভাল জায়গাগুলির বেশিরভাগই দখল করেছিল ব্রিটেন। আফ্রিকা মহাদেশের এক কোটি পনর লক্ষ বর্গমাইল ভূখণ্ডের প্রায় ৪০ লক্ষ বর্গমাইল ফ্রান্সের দখলে এলেও এর বেশিরভাগটাই ছিল সাহারা মরুভূমি। ব্রিটেন অধিকার করেছিল ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গমাইল জায়গা। প্রকৃতপক্ষে উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে ভূমধ্য সাগরের উপকূল পর্যন্ত ব্রিটেনের একটানা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ফলে অর্থনৈতিক ও সামরিক উভয় দিক থেকেই ব্রিটেন সবচেয়ে লাভবান হয়। জার্মানি ও বেলজিয়ামের অধিকারভুক্ত হয়েছিল যথাক্রমে ৯ লক্ষ ও প্রায় ৯ লক্ষ বর্গ মাইল জায়গা। আর পর্তুগাল, ইতালি এবং স্পেনের কুক্ষিগত হয় যথাক্রমে ৮ লক্ষ, ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ও এক লক্ষ বর্গমাইল এলাকা। আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) ও লাইবেরিয়া—এই দুটি রাষ্ট্রের মোট আয়তন ছিল মাত্র ৪ লক্ষ বর্গমাইল অর্থাৎ সমগ্র আফ্রিকার মাত্র ১০০ ভাগের ৩০ ভাগ।

আপসে আফ্রিকা ভাগাভাগি হয়ে গেল। এবার 'অনুন্নত ও অসভ্য' কৃষ্ণাঙ্গদের

সত্য করে তোলার জন্যে ব্রতে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ ব্রতী হলেন। শান্তি ও সৌভ্রাত্রের জয়গানে ইউরোপ-আমেরিকা মুখরিত হয়ে উঠল, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ঘন ঘন সম্মেলন ও বৈঠক বসতে লাগল, সমৃদ্ধ ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুশী মনে গুছিয়ে বসার চেষ্টা করতে লাগল। এখন 'সর্বত্র শান্তি, মাথার উপরে ঈশ্বর'।

কিন্তু তথাকথিত এই 'শান্তি ও সহযোগিতা'র আবহাওয়ার মধ্যেই দেখা দিল অশান্তি ও বিরোধের কালো মেঘ। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়ে উঠল। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী জোসেফ চেম্বারলেন সাম্রাজ্যবাদকে "প্রকৃত বিজ্ঞজনোচিত ও স্বল্পব্যয়সাধ্য" কর্মনীতি বলে অভিহিত করে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ওকালতি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেন জার্মানি, বেলজিয়াম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে এবার বলতেও তিনি ভুললেন না।

এই প্রতিযোগিতা থেকে মুক্তিলাভের উপায় কি?—উপায় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা—জবাব দিলেন ধনপতিরা। গড়ে উঠতে লাগল বড় বড় বাণিজ্য সংঘ, শিল্প সংঘ। ধনপতিদের কথায় সায় দিয়ে ধনিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা পৃথিবীর অধিকৃত অঞ্চলগুলি ভাগবাটোয়ারার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। আর এরই সঙ্গে উপনিবেশগুলিতে শাসন ও শোষণের ব্যবস্থা আরও পাকাপোক্ত করা হলো।

কৃষ্ণ আফ্রিকার জনগণ তখন বিমূঢ়, বিপর্যস্ত। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে তাদের জীবনধারার অবসান ঘটেছে অথচ নতুন কোনো জীবনধারার সন্ধান তারা পায়নি। তাই বার বার তারা পুরাতন জীবনধারাকে ফিরে পাওয়ার জন্যে ব্যর্থ প্রয়াসে নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছে।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালেই শুরু হয়েছে লগ্নী পুঁজির (ফিনান্স-ক্যাপিটাল) দাপট। শাসন ও শোষণের পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যক্ত, কৃষ্ণ-আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো যথাসম্ভব বজায় রেখে উপজাতীয় সর্দার রাজা ও সুলতানদের মাধ্যমে আফ্রিকানদের শাসন ও শোষণের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত। ফলে নতুন সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও আফ্রিকানরা কিছুমাত্র লাভবান হলোনা, অথচ "অন্ধকার মহাদেশে" ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্যে ইউরোপীয়রা কী অসাধ্য সাধন করেছে তা ফলাও করে প্রচারের সর্ববিধ পন্থা অবলম্বন করা হলো।

স্থায়ীভাবে উপনিবেশ শাসন ও শোষণের জন্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল। যেখানে কৃষি বেশ উন্নত সেখানে যেসব কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রচুর মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা ছিল সেখানে শাদকরা কৃষিজাত পণ্য

ক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করলেন। আফ্রিকান কৃষকদের নিজেদের ইচ্ছামত কেনা-বেচার ক্ষমতা আর থাকল না। আবার যেখানে আবহাওয়া ইউরোপীয়দের বসবাসের পক্ষে অনুকূল এবং উর্বর জমিরও অভাব নেই সেখানে প্রয়োজনমত আফ্রিকানদের উৎখাত করে ইউরোপীয়দের বসবাস ও চাষ আবাদ করার জন্যে প্রচুর জমি দেওয়া হলো। যেমন কেনিয়ায় ১৯১৫ সালের মধ্যে আফ্রিকানদের কাছ থেকে প্রায় ৪৫ লক্ষ একর উৎকৃষ্ট জমি কেড়ে নিয়ে মাত্র এক হাজার শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আর অনুর্বর অঞ্চলগুলিতে "সংরক্ষিত অঞ্চল" বলে ঘোষণা করে মাত্র ৫২ হাজার বর্গমাইল এলাকায় বাস ও চাষ আবাদ করতে বাধ্য করা হয়েছিল প্রায় ৫০ লক্ষ আফ্রিকানকে। দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও একই পদ্ধতিতে আফ্রিকানদের জমি দখল ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে তা বণ্টন করা হয়।

এ ছাড়া অনেক অঞ্চলে (প্রধানত ফ্রান্সের অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে) হাজার হাজার একর জমি তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন কোম্পানির হাতে। নির্ধারিত বার্ষিক খাজনা এবং মুনাফার একটা অংশ সরকারকে দিতে হবে এই শর্তে এইসব কোম্পানিতে শোষণের অবাধ অধিকার দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় বড়ো বড়ো বাগিচা গড়ে তোলা হয়। এ ব্যাপারে জার্মানরা ট্যাঙ্গানাইকা, টোগো ও ক্যামেরুনে বেশ সাফল্য অর্জন করে। ৫৮টি জার্মান কোম্পানি বিপুল পরিমাণ জমির মালিক হয়ে নির্মমভাবে আফ্রিকানদের শোষণ করে।

চাষ-আবাদ ছাড়াও খনিজ সম্পদ আহরণের জন্যে ইওরোপীয়রা বড়ো বড়ো কোম্পানি গঠন করে। এইসব কোম্পানি যেসব জায়গা ইজারা নেয় সেসব জায়গায় এদের একাধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল।

কৃষিজাত পণ্য ও খনিজ দ্রব্যাদি আহরণ এবং রপ্তানি, আর তারই সঙ্গে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের পণ্য আফ্রিকায় আমদানির উদ্দেশ্যে (এবং সামরিক উদ্দেশ্যেও বটে) অধিকৃত উপনিবেশগুলিতে রেল লাইন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বসানো, বন্দর ও পথঘাট নির্মাণের জন্যে বহু লোকের দরকার হয়। এ ছাড়া শ্বেতাঙ্গ কৃষিজীবীদেরও বড়ো বড়ো বাগিচার কাজ করার জন্যে অনেক লোকের প্রয়োজন দেখা দেয়। জমি থেকে উৎখাত করে, মাথাপিছু ট্যাক্স (জিজিয়া) ধার্য করে আফ্রিকানদের শ্রমিকের কাজ নিতে বাধ্য করা হয়। অনেক অঞ্চলে (বিশেষ করে পর্তুগাল ও ইতালির অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে) আফ্রিকানদের 'বেগার' খাটতে বাধ্য করা হয়। এদের জন্যে মালিকদের কোনো দায়দায়িত্ব ছিলনা। নির্মমভাবে খাটানোর ফলে বহু আফ্রিকানের

জীবনদীপ অকালেই নিভে যায়। কখনও বেয়াড়া আফ্রিকানদের শায়েস্তা করার নামে, কখনও অন্য অজুহাতে সভ্য ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কৃষ্ণ আফ্রিকার মানুষদের জমি, গবাদি পশু কেড়ে নিল, চাপিয়ে দিল গুরুভার করের বোঝা। নিঃস্ব অসহায় আফ্রিকানদের শ্রম বেচে খাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। বেঁচে থাকার মত সামান্য মজুরী দিয়ে শ্বেতাঙ্গরা তাদের খাটিয়ে রাজার হালে বাস করতে লাগল। গড়ে তুলতে থাকল মুনাফার পাহাড়।

আর 'অসভ্য ও বর্বর' কৃষ্ণাঙ্গদের সভ্য করে তোলার 'মহৎ ব্রত' কিভাবে পালিত হয়েছিল তার দু'একটা দৃষ্টান্ত লক্ষ করলেই যথেষ্ট হবে। সরকারের আয়ের প্রধান উৎস ছিল প্রধানত প্রত্যক্ষ কর এবং শুল্ক। এই আয়ের একটা মোটা অংশই ব্যয়িত হতো প্রশাসন খাতে, বিশেষ করে আইন ও শৃংখলা রক্ষার খাতে। ব্রিটিশ শাসিত নাইজেরিয়ায় প্রশাসন খাতে ব্যয় করা হতো মোট রাজস্বের ৩০ শতাংশ, কেনিয়ায় ৩৮'৮, উগাণ্ডায় ৩৩'৪ এবং নায়াসাল্যাণ্ডে (মালাউই) ৩০.১৮ শতাংশ। প্রশাসন ও অন্যান্য খাতে ব্যয় বরাদ্দের পর শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি জনকল্যাণ খাতে বেশী ব্যয়বরাদ্দ করা সম্ভব হতোনা।

১৯৩৮ সালেও শিক্ষাখাতে নাইজেরিয়া, কেনিয়া, উগাণ্ডা ও নায়াসাল্যাণ্ডে যথাক্রমে মোট রাজস্বের মাত্র ৫.৯, ৯.৯ (কেনয়ায় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের জন্যে ব্যয় কিছুটা বেশী করা হতো, এর মধ্যে আফ্রিকানদের ভাগে পড়ত মাত্র ৫ শতাংশ), ৬.৭ ও ৪'৭ শতাংশ।

কাজেই অতি স্বল্পসংখ্যক লোক আধুনিক শিক্ষালাভ করতে পেরেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে থাকতে বাধ্য হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের পথ সুগম করেছে।

উপরে যেসব উপনিবেশের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হলো আফ্রিকার উপনিবেশ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে 'সুশাসিত' অঞ্চল। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং বিশেষ করে পর্তুগালের অধীন উপনিবেশগুলির অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। পর্তুগীজ আফ্রিকায় পুরোদস্তুর দাস প্রথাই চালু ছিল বলা যায় এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা খাতে বরাদ্দ হতো ছিটেফোঁটা। তাই বেসিল ডেভিডসন সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন :

"তত্ত্বের দিক থেকে আফ্রিকানদের কল্যাণের জন্যে প্রগতি ও অছিগিরির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ফারাক রয়ে গেছে।"

আসলে কমবেশি পরিমাণে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কট্টর সাম্রাজ্যবাদী সিসিল

রোডস্-এর উপদেশ মেনে চলেছে অক্ষরে অক্ষরে।

রোডস্ কেপ বিধানসভায় তার প্রস্তাবিত ব্যবস্থার উল্লেখ করে বলেছিলেন: "এভাবে আপনারা তাদের (আফ্রিকানদের) জীবন থেকে মন্থরতা ও কুঁড়েমি দূর করবেন, তাদের শ্রমের মর্যাদা শেখাবেন এবং রাষ্ট্রের সমৃদ্ধিতে তাদের অবদান দেওয়াবেন ও আমাদের বিজ্ঞ ও সাধু সরকারের জন্য তাদের দিক থেকে কিছু প্রতিদান দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।"

তাই হাজার হাজার মানুষকে তাদের জমি জায়গা থেকে উৎখাত করে এবং মাথাপিছু অসম্ভব কর ধার্য করে রেলপথ, ডক, ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করতে এবং কোনোক্রমে জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী দিয়ে তাদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে বাধ্য করে কৃষ্ণ আফ্রিকার সর্বত্র কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের শ্রমের মর্যাদাবোধ শেখানো হয়েছে, উপনিবেশসমূহের সমৃদ্ধি অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ শোষকশ্রেণীর সমৃদ্ধি ঘটানোর জন্যে প্রাণপাত করতে এবং 'বিজ্ঞ ও সাধু সরকার' চালু রাখার জন্যে তাদের কি করে সর্বস্ব নিবেদন করতে হয় তা শেখানো হয়েছে। এটাই হলো 'আফ্রিকার ইয়োরোপীয়-করণ এর নির্গলিতার্থ। আর এরই জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল স্বল্পসংখ্যক আফ্রিকানকে ইয়োরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে আধুনিক করে তোলার।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে যেসব আফ্রিকান পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করে-ছিলেন তাঁদের দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল ইয়োরোপীয়দের সাহায্যেই তাঁরা মানুষ হয়ে উঠবেন, তাঁদের দেশ আধুনিক হয়ে উঠবে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ থেকে এঁরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন দীর্ঘকাল। জনগণ তাদের পুরাতন সমাজ, পুরাতন জীবন-যাত্রাকে তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ভুলতে পারেনি, ফলে তারা কখনও আপস করে চলেছে, কখনও নতুন আকারে পুরাতনকে রূপ দিতে চেয়েছে, কখনও আত্মরক্ষার ও নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখার কোনো উপায় না দেখতে পেয়ে মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ করেছে। রক্তস্রোতে ডুবে গেছে সেসব বিদ্রোহ, কিন্তু তুষের আগুনের মতো সেইসব বিদ্রোহের আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলেছে, নিভে যায়নি।

৮

"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘমাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
ভয়ঙ্করী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, ক্ষোভে ক্ষোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়মন্থনক্ষোভে
ভদ্রবেশি বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে।

—নৈবেদ্য : রবীন্দ্রনাথ।

পৃথিবী ভাগবাঁটোয়ারা সম্পন্ন হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মধ্যে প্রতিযোগিতা উঠল চরমে। এই প্রতিযোগিতা যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে রূপান্তরিত হবে তার পূর্বাভাষ পাওয়া গেল ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের স্পেন-মার্কিন যুদ্ধে, ১৮৯৯-১৯০২ খ্রীস্টাব্দের বুয়র যুদ্ধে, ১৯০৪-৫ খ্রীস্টাব্দের রুশ-জাপ যুদ্ধে, ১৯১১-১২ খ্রীস্টাব্দে ইতালি-তুরস্ক যুদ্ধে। পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল পৃথিবীতে বিভিন্ন শক্তিবর্গের অধিকৃত অঞ্চলগুলি নতুন করে ভাগাভাগির পালা শুরু হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালেই নতুন দুটি শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল। এছাড়া এশিয়াতেও জাপান পুঁজিবাদী রাষ্ট্ররূপে মাথা তুলেছিল। প্রথমোক্ত দুটি রাষ্ট্র হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের সংকটের পর জার্মানিতে একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শিল্পক্ষেত্রে 'মাৎসন্যায়' দেখা দেয়, বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলি ছোটদের গ্রাস করে ফুলে ফেঁপে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটতে থাকে।

এর অনিবার্য পরিণতি রূপে বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা তীব্র আকারে দেখা দিল। তৈল আহরণকারী বিশাল প্রতিষ্ঠানগুলি সারা দুনিয়ার তৈলসম্পদ ভাগা-ভাগি করার সংগ্রামে লিপ্ত হলো। শুরু হলো পৃথিবী ভাগাভাগির লড়াই।" দেখতে দেখতে দেখতে বৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল তা ভূখণ্ড দখলের লড়াইতে পরিণত হলো।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বাভাষ যেমন রবীন্দ্রনাথের কল্পনানেত্রে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল বুয়র যুদ্ধের সময়, তখনই এর পূর্বাভাষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কোনো কোনো ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীর কাছে। ফরাসি ঐতিহাসিক দ্রিয় তার উনবিংশ শতাব্দীর শেষে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ" গ্রন্থের "বৃহৎ শক্তিবর্গ ও পৃথিবী ভাগবাটোয়ারা" শীর্ষক অধ্যায়ে লেখেন:

"সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চীন ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত মুক্ত ভূখণ্ড ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার শক্তিবর্গ কর্তৃক অধিকৃত হয়েছে। এই ব্যাপার নিয়ে কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটে গেছে ও একের জায়গায় অন্যের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাতে অদূর ভবিষ্যতে আরও সাঙ্ঘাতিক যুদ্ধের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।" তাই তাড়াহুড়ো করে সব পুঁজিবাদী শক্তি পৃথিবী ভাগাভাগির লড়াইতে নেবে পড়ল। এখন ভাগ না পেলে আর তো পাওয়া যাবেনা! পৃথিবীকে শোষণ করার সুযোগ ছেড়ে দিতে কেউ রাজী নয়। "তাই সমগ্র ইয়োরোপ ও আমেরিকা সম্প্রতি" ঔপনিবেশিক 'সম্প্রসারণের', 'সাম্রাজ্যবাদের' জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে যা কিনা উনবিংশ শতাব্দীর অবসানকালের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য।

বারুদ স্তূপীকৃত হয়েই ছিল। সার্বিয়ার সারাজোভো শহরে হ্যাপসবুর্গ সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাট আততায়ী কর্তৃক নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই বারুদের স্তূপে আগুন লেগে গেল। দেখতে দেখতে সারা পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে মহাযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ল, কটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে ৬টি বৃহৎ শক্তি জড়িয়ে পড়ল এই মহাযুদ্ধে।

প্রথম মহাযুদ্ধে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি। উদীয়মান জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে হটিয়ে দিয়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে

চেয়েছিল। জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্স শুধু নিজেদের উপনিবেশগুলি রক্ষার জন্যে সর্বতোভাবে প্রস্তুত হলোনা, জার্মানির উপনিবেশগুলি দখল করতেও উদ্যোগী হলো। ফলে যুদ্ধের আফ্রিকাতেও যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়ল।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ কৃষ্ণ আফ্রিকার মানুষের মনে অসন্তোষ জাগিয়েছিল। প্রথম দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক আফ্রিকান সরকারি কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবীদের এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ব্যবধান গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণের পদ্ধতি ক্রমেই সে ব্যবধান দূর করে কৃষ্ণ আফ্রিকার জনজাগরণের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। মহাযুদ্ধ এই প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করল।

সমগ্র কৃষ্ণ আফ্রিকা সহসা এক বিরাট পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের ঘূর্ণাবর্ত কৃষ্ণ আফ্রিকাকে সরাসরি টেনে নিয়ে এল পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও বিরোধের মধ্যে। তারা চিরাচরিত জীবনধারার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও বিপর্যস্ত হয়ে গেল। এক নতুন চেতনা কৃষ্ণ আফ্রিকার মানুষের মনকে উদ্বেলিত করে তুলল। পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক গভীর ও মৌল পরিবর্তন ঘটে গেল।

প্রথম মহাযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের অন্তর্বিরোধের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। এই অন্তর্বিরোধের পরিণতি স্বরূপ একদিকে ঘটল অক্টোবর মহাবিপ্লব এবং অন্যদিকে ভাঙন ধরল সাম্রাজ্যবাদের শক্ত ভিতে। এই বিরাট পরিবর্তনের ধাক্কা লাগল এশিয়া; আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সমস্ত দেশে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ যে যার ঘর সামলানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এর ফলে তাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ বিসম্বাদ আর ও তীব্র আকার ধারণ করল। বিজিত জার্মানি ও সমর্থকদের ঘাড় ভেঙে বিজেতা মিত্র শক্তিবর্গ তাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠল। আফ্রিকাকে নতুন করে ভাগবাঁটোয়ারা করা হলো। অবশ্য, আফ্রিকার অবজ্ঞাত ও নিপীড়িত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা তখন চোখ মেলেছে, প্রতিরোধের সঙ্কল্প জেগেছে তাদের মনে। তাই, সাম্রাজ্যবাদীরা সতর্ক হয়েছিল। এবার ভাগ বাঁটোয়ারা হলো নতুন কায়দায়। বিজেতা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ ও তাদের স্যাঙাতরা বিজিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপনিবেশগুলির জাতিসংঘ নিয়োজিত অভিভাবকরূপে দেখা দিল। এই নতুন ব্যবস্থা 'ম্যানডেট' ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

অতীতের ঔপনিবেশিক শাসনের রূপের সঙ্গে এই নতুন রূপের মূলগত কোনো পার্থক্য ছিলনা। তাই লেনিন বলেছিলেন যে, ম্যানডেট বণ্টনের সারকথা হলো

"লুটতরাজের" ব্যবস্থা।

আফ্রিকার জার্মানির উপনিবেশগুলি বিজেতা শক্তিবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন করা হলো: ব্রিটেন পশ্চিম ক্যামেরুন, পশ্চিম টোগো ও ট্যাঙ্গানাইকা শাসনের; দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা শাসনের (ব্রিটেন তার ম্যানডেট দক্ষিণ আফ্রিকাকে দিয়ে দেয়); ফ্রান্স পূর্ব ক্যামেরুন ও পূর্ব টোগো শাসনের এবং বেলজিয়াম রোয়াণ্ডা-উরুণ্ডি শাসনের জাতিসংঘ ম্যানডেট লাভ করে।

এ ছাড়া পর্তুগাল পায় জার্মান পূর্ব আফ্রিকার কিয়োংগা জেলা। এই জেলাটিকে মোজাম্বিকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন যে যার 'নিজের কোলে বেশী ঝোল টানতে' ব্যস্ত তখনই তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে শুরু করেছে। সাম্রাজ্যবাদ নিজেই তার মৃত্যুবাণ তৈরি করেছিল। আফ্রিকায় শুধু সে তার নিজের প্রয়োজনে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার ভিত গড়ে তোলেনি, তার নিজের প্রয়োজনে সে হাজার হাজার আফ্রিকানকে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে, আধুনিক যান ও অন্যান্য যন্ত্র চালনায় দক্ষ করে তুলতে বাধ্য হয়েছিল।[১] হাজার হাজার আফ্রিকান এই প্রথম তাদের শক্তি উপলব্ধি করল। রণক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ ভেদ

১ ফ্রান্স ২ লক্ষ ১০ হাজার আফ্রিকার সৈন্যের বিরাট বাহিনী গড়ে তুলেছিল। এই বাহিনীর ১ লক্ষ ৭০ হাজার সৈন্য ইয়োরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনের ভয়ঙ্করতম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সরকারি তালিকায় ২৪, ৭৬২ জন নিহত বলে ঘোষিত হয়, যাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি; তাদের নিখোঁজ বলে ঘোষণা করা হয়। হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা জানা না গেলেও কম-সে-কম এক-পঞ্চমাংশ আফ্রিকান সৈন্য নিহত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

ব্রিটেন পশ্চিম আফ্রিকায় ২৫ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে। পূর্ব আফ্রিকায় অল্প সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করা হলে সমরসম্ভার বহন ও অন্যান্য কাজের জন্যে শ্রমিক সংগ্রহ করা হয় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। এদের মধ্যে রণক্ষেত্রে নিহত হয় ৪৬, ৬১৮ জন। এদের ৪০ হাজারের বেশী লোকের আত্মীয়-স্বজনকে নাকি খুঁজে বের করা যায়নি, তাই এদের প্রাপ্য মজুরী ও মাইনে বাবদ দেড় লক্ষাধিক পাউণ্ডের কোনো দাবিদার নেই অর্থাৎ এই বিপুল অর্থ ব্রিটিশ সরকারের হাতেই থেকে গেছে।

জার্মানরা তাদের উপনিবেশগুলি থেকে সংগ্রহ করেছিল ১১ হাজার আফ্রিকান সৈন্য।

(পার্থক্য বজায় রাখার সর্বপ্রকার অপচেষ্টা সত্বেও) বিলুপ্ত হয়ে গেল। কৃষ্ণাঙ্গরা বুঝতে পারল যে, শ্বেতাঙ্গরা তাদের মতই সাধারণ মানুষ এবং অনেক-ক্ষেত্রেই তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়। পরাধীন জাতির হীনমন্যতার অবসান ঘটার অর্থ নবজাগরণের সূচনা হওয়া। আফ্রিকায় সেই নবজাগরণের সূচনা হলো।

যুদ্ধক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকরা শুধু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পড়ল তা' নয়, তারা পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এল, তাদের মধ্যে চিন্তার আদান প্রদান হলো। সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর লক্ষ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের মধ্যে বহু প্রগতিশীল ও বিপ্লবী সৈনিক ছিলেন। তাঁরা নতুন আদর্শ, নতুন জীবনের বাণী শোনালেন আফ্রিকান সৈন্যদের। যুদ্ধের পর সারা আফ্রিকায় অক্টোবর মহাবিপ্লব, সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের অজস্র খবর ছড়িয়ে দিল যুদ্ধ ফেরৎ আফ্রিকান সৈন্যরা। এদের অনেকেই পরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশগুলির স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে এবং মান্ধাতার আমলের সামাজিক সম্পর্কের রূপগুলি বজায় রেখে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেয়। এ ছাড়া আফ্রিকানরা যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে তার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীরা নানাভাবে উসকানি দিয়ে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মধ্যে বক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধিয়ে নিজেদের নিরপেক্ষ সালিশরূপে জাহির করে আসর জাঁকিয়ে বসে। কিন্তু অতি মুনাফার লোভে সাম্রাজ্যবাদী ধনপতিরা আহরণ শিল্প (বিভিন্ন ধাতু, হীরা প্রভৃতি), বাগিচা শিল্প প্রভৃতির দ্রুত প্রসার ঘটায়; বন্দর রেলপথ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করে। এব ফলে আফ্রিকায় পুঁজিবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে শেষ পর্যন্ত সনাতন সমাজ ব্যবস্থার ভাঙন ধরে এবং নতুন সামাজিক শক্তি-সমূহের, যেমন জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী, ক্ষেতমজুর ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে।

অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত অংশই বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতের মুঠোর মধ্যে থাকায় আফ্রিকান শ্রমিকরা বিদেশী পুঁজিপতি, ক্ষেতখামার সমূহের বিদেশী মালিক, বিদেশী কোম্পানি, বিদেশী বাগিচা মালিক, বিদেশী শিল্পপতিদের শোষকরূপে দেখতে শেখে। আফ্রিকান শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্যভাবেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হয়ে ওঠে।

আফ্রিকায় শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটলেও শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল খুব কম এবং তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে তারা ছিল অপরিপক্ক এবং সাংগঠনিক দিক থেকে

দুর্বল। স্বাধীন শ্রেণীরূপে আফ্রিকান শ্রমিকরা কেবল গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। কাজের মরশুমে চাষীরা তাদের গ্রাম থেকে চলে যেত বিভিন্ন জায়গায়, মরশুম শেষ হলেই তারা আবার ফিরে যেত যার যার গ্রামে। আবার একটা মরশুমে একদল চাষীর সঙ্গে হয়তো ১৫ দিনের চুক্তি হলো। চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ফিরে গেলে তাদের জায়গায় অন্য অঞ্চলের চাষীদের সঙ্গে মালিকরা চুক্তি করত। এভাবে একটা সুশৃঙ্খল শ্রমিকশ্রেণী বা শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠা খুবই কঠিন। তবু মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজেরিয়া. তিউনিস ও মরক্কোর মতো কিছুটা উন্নত দেশগুলিতে বেশ শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণী গড়ে ওঠে এবং এর ফলে ২০-এর দশকের গোড়ার দিকে মিশর ও দক্ষিণ-আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের অধীন আলজেরিয়া, তিউনিস ও মরক্কোয় ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ট্রেড ইউনিয়নও এই সময় গড়ে উঠতে থাকে, তবে গোড়ার দিকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা ও আলজেরিয়ার শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদীদের নির্মম শোষণের শিকার হয়েছিল চাষীরা। কিন্তু দীর্ঘকাল তারা নীরবে সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করেছিল। এর কারণ গ্রামাঞ্চলে সমস্ত সামন্ত ও উপজাতি সর্দারদের আধিপত্য ও সনাতন সমাজব্যবস্থা চাষীদের অসন্তোষের আগুনকে জ্বলে উঠতে দেয়নি। আর সাম্রাজ্যবাদীরা চাষীদের তাঁবে রাখার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই পুরাতন ব্যবস্থা বজায় রেখেছিল। কিন্তু উপনিবেশবাদী শ্বেতাঙ্গরা যখন জোর করে চাষীদের সবচেয়ে উর্বর জমিগুলি নানা কৌশলে বা বলপ্রয়োগে দখল করে নিতে থাকল এবং আফ্রিকান চাষীদের রপ্তানিযোগ্য শুধু একটি কি দুটি শস্য ফলাতে বাধ্য করে তাদের নিদারুণ দুর্গতির সম্মুখীন করল তখন সনাতন সমাজব্যবস্থার বাধ আর কৃষক আন্দোলনের প্রবল বন্যাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

আফ্রিকান শ্রমিকদের যখন যেখানে সুবিধা সেখানে কাজ করতে যাওয়ার প্রবণতা একটা স্থায়ী শ্রমিকশ্রেণী গড়ে ওঠার পথে প্রতিকূল হলেও এই রকম চলাচল উপজাতিগত গণ্ডী ভেঙে দেয় এবং এক জাতীয় সংহতির সূচনা করে। মরশুমী কাজ গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগ ঘনিষ্ঠ করে তোলে এবং গ্রামের চাষীরাও নতুন যুগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। এইভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে চাষী, শ্রমিক এবং শহরের আধা-শ্রমিকরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান বাহিনী গঠন করে।

ঔপনিবেশিক শাসনে আফ্রিকায় জাতীয় ধনিকশ্রেণীর যে অঙ্কুর মাথা তোলে

তা যাতে আর বাড়তে না পারে তজ্জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। কেবলমাত্র মিশর, আলজেরিয়া, মরক্কোর মতো কয়েকটি আরব-প্রধান দেশে জাতীয় ধনিকশ্রেণী কিছুটা মাথা তুলতে সক্ষম হয়। অন্যান্য দেশে খুদে ধনিকশ্রেণী কোনোরকমে টিঁকে থাকে।

এই অবস্থায় জাতীয় ধনিকশ্রেণী বা পেটিবুর্জোয়াদের পক্ষে মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণের কোনো সম্ভাবনাই ছিলনা। স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবীই মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন এবং এঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মুক্তি আন্দোলন বেশ প্রবল হয়ে ওঠে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে কেনিয়া, গোল্ড কোস্ট (ঘানা), নাইজেরিয়া গাম্বিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে রাজনৈতিক পার্টি ও সমিতি গড়ে ওঠে।

ক্রমে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের আন্দোলনগুলির মধ্যে সারা আফ্রিকা জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা দেয়। এ সময় আন্দোলন ছিল খুব প্রাথমিক স্তরে, আবেদন নিবেদনের স্তরে। আফ্রিকা মহাদেশব্যাপী আন্দোলনও এই স্তর ছাড়িয়ে প্রথম দিকে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্যারিসে ১৯১৯ সালে প্যারিস শান্তি সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হয় তখনই সেখানে প্রথম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসেব অধিবেশন বসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেব বিশ্ববিখ্যাত নিগ্রো পণ্ডিত ও জননেতা উইলিয়াম দু' বয়ের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো আন্দোলনের নেতাদের উদ্যোগেই এই কংগ্রেস বা মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কংগ্রেস শাসক দেশগুলির সরকারদের কাছে আফ্রিকানদের প্রশাসন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়ার, দাসপ্রথা ও বেকার-প্রথার অবসান ঘটানোর, দৈহিক শাস্তিদানের পদ্ধতি লোপ করার জন্যে আবেদন জানায়। প্রথমটির মতো পরবর্তী তিনটি কংগ্রেসেরও (২য় কংগ্রেস, ১৯২১, লনডন, ব্রুসেলস ও প্যারিসে অনুষ্ঠিত, তৃতীয় কংগ্রেস, ১৯২৩, লনডন ও লিসবনে অনুষ্ঠিত এবং চতুর্থ কংগ্রেস, ১৯২৭, নিউ-ইয়র্কে অনুষ্ঠিত) প্রবণতা ছিল সমগ্র আফ্রিকা অপেক্ষা সমগ্র নিগ্রো আন্দোলনাভিমুখী।

অক্টোবর মহাবিপ্লবের অব্যবহিত পরেই আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ ওঠে। অপেক্ষাকৃত উন্নত উত্তর-আফ্রিকার দেশগুলিতে এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তীব্র আকারে দেখা দেয়। পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংঘর্ষের প্রাথমিক স্তরে পৃথিবীতে যত উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালিত হয় ১৯১৯ ও ১৯২১ সালের মিশরীয়দের বিদ্রোহ এবং ফরাসি ও স্প্যানিস উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে রিফ প্রজাতন্ত্রের (মরক্কো) পাঁচ বৎসর ব্যাপী

সমগ্র সংগ্রাম সেগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ১৯২০ সালে দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নে অভূতপূর্ব ধর্মঘটের প্লাবন আসে। উইট ওয়াটারস র‍্যানডে ৭০ হাজার আফ্রিকান খনিশ্রমিক ধর্মঘট করে এবং ১৯২২ সালে ইয়োরোপীয় শ্রমিকদের ধর্মঘট সমগ্র অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে।

আফ্রিকার গ্রীষ্ম-প্রধান অঞ্চলে এই ধরনের কোনো বৈপ্লবিক আন্দোলন সৃষ্টি না হলেও স্বাধীনতা সংগ্রাম ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে। নাইজেরিয়া, কেনিয়া, ফরাসি পশ্চিম আফ্রিকা, বেলজিয়ান কংগো ও অন্যান্য দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অভ্যুদয় ঘটে।

১৯২৪-১৯২৯ সালে পুঁজিবাদ আপেক্ষিক ও আংশিকভাবে স্থিতিশীলতা লাভ করলেও ও আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রামে ভাঁটা পড়েনি। অথচ ইয়োরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণ-আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। এর কারণ আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলিকে আরও নিবিড়ভাবে শোষণ করেই ইঙ্গ-মার্কিন ধনপতিরা তাঁদের দেশগুলিতে স্থিতিশীলতা (আপেক্ষিক) ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। আফ্রিকার শোষিত জনগণ এই শোষণের প্রতিবাদে আরও সোচ্চার ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। মিশর ও তিউনিসিয়ায় ধর্মঘটের প্রথম তরঙ্গোচ্ছ্বাস বিদেশী পুঁজিপতিদের সন্ত্রস্ত করে তোলে। মরক্কোয় রিফ বিদ্রোহ ১৯২৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলে। ইতালি অধিকৃত সোমালিল্যান্ডে, ফরাসি উপ-নিবেশ চাঙ্গ, মধ্য কংগো ও ফরাসি ক্যামেরুনে এবং অ্যাংগোলায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। মোজাম্বিক, মাদাগাসকার ও সিয়েরালিওনে ধর্মঘটের ঢেউ উত্তাল হয়ে ওঠে।

১৯২৯-১৯৩১ সালের 'মহামন্দা' পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। এই মহামন্দার ধাক্কা সামলানোর জন্যে আফ্রিকায় পশ্চিমী পুঁজিপতিরা উপনিবেশ-গুলিতে শোষণের মাত্রা দারুণভাবে বাড়িয়ে দেয়। তারা নতুন নতুন উর্বর জমি দখল করতে থাকে, বেগার প্রথা ব্যাপকতর তীব্রতর করে। আফ্রিকান চাষীদের রপ্তানিযোগ্য সমস্ত পণ্যের (কৃষিজাত পণ্য) দাম কমিয়ে দেয়, কর বৃদ্ধি করে, ব্যাপকভাবে আফ্রিকান শ্রমিকদের ছাঁটাই করে এবং মজুরী কমিয়ে দেয়। এর ফলে আফ্রিকার উপনিবেশগুলিকে তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং মিশর অ্যাংগোলা ও বেলজিয়ান কংগোতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে, শ্রমিক ও খেতমজুরদের বড়বড় ধর্মঘট আফ্রিকার গণ-আন্দোলনে এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে, শহরে শহরে রাজনৈতিক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ ও ফৌজের সঙ্গে জনগণের ঘনঘন সংঘর্ষ ঘটে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আফ্রিকান পুলিশ জনসাধারণের

বিক্ষোভ মিছিল বা ধর্মঘটীদের উপর আক্রমণ চালানোর হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করে।

এই সময় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি আফ্রিকার বুদ্ধিজীবী মহলগুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

'মহামন্দার' কালো ছায়া অপসৃত হতে না হতেই পৃথিবীর বুকে নেমে আসে ফ্যাসিজমের কালো ছায়া। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হয়। ফ্যাসিস্ট-ইতালি ও নাৎসী-জার্মানির রণহুঙ্কার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসন্ন করে তোলে। জার্মান ও ইতালিয়ান ফ্যাসিস্টরা আফ্রিকার উপনিবেশগুলি পুনর্বণ্টনের দাবি তোলে।

উপনিবেশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্ট ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে আবিসিনিয়া প্রবল বিক্রমে রুখে দাঁড়ায়। আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ আফ্রিকার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে। ফ্যাসিস্ট আগ্রাসন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মানুষকে আরও ঐক্যবদ্ধ করে।

এই সময় ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'হস্তক্ষেপ না-করার' নীতির নামে কার্যত ফ্যাসিস্ট ইতালিকেই মদত দেয়। একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই ইতালির আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করে। এর ফলে আফ্রিকানদের চোখ খুলে যায়, তারা বুঝতে পারে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নই আফ্রিকার প্রকৃত মিত্র।

আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের বন্যা সাম্রাজ্যবাদের দুর্গ প্রাকারে ফাটল ধরায়। সন্ত্রস্ত উপনিবেশবাদীরা কিছু কিছু সুবিধা ও অধিকার দিয়ে বিক্ষুব্ধ আফ্রিকানদের খুশী করার চেষ্টা করতে থাকে। মিশর আর ব্রিটেনের আশ্রিত রাজ্য বলে গণ্য না হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে গণ্য হয়, যদিও মিশর ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের মুঠোর মধ্যেই থেকে যায়। কয়েকটি উপনিবেশে আইন সভায় আফ্রিকানদের প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার দেওয়া হয়, পৌর-সংস্থাগুলিতে আফ্রিকানদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। যত সামান্যই হোক এইসব অধিকার উপনিবেশিক ব্যবস্থায় যে ফাটল ধরায় তা ক্রমেই বড়ো হতে থাকে।

৯

দামামা ঐ বাজে
দিন বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে
—রবীন্দ্রনাথ

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে, পরিত্রাণ লাভের উন্মত্ত প্রচেষ্টায় পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের ধ্বজা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রকাশ্যভাবেই একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছে, সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে দক্ষিণপন্থীরা ফ্যাসিবাদের দিকে ঝুঁকছে।

জার্মানি ও ইতালিতে ফ্যাসিষ্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই সারা পৃথিবীতে এক নিদারুণ দুর্দিন ঘনিয়ে এল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণ-পন্থী সরকারদের তোষণ-নীতি ফ্যাসিষ্টদের উৎসাহিত করল।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নাৎসী জার্মানিকে লেলিয়ে দেওয়ার পশ্চিমী-চক্রান্তের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে নাৎসি সরকার যখন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের টনক নড়ল। প্রবল জনমতের কাছে নতি স্বীকার করে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলি পিছু হটতে বাধ্য হলো। কিন্তু যাঁরা নতুন সরকারগুলি গঠন করলেন তাঁরাও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেও নানাভাবে আপস করার এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গকে লেলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত হলেন। বিজয়োন্মত্ত নাৎসি জার্মানি তাঁদের কথায় কর্ণপাত করল না।

শেষপর্যন্ত ঝড় উঠল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর ঝড়। আফ্রিকার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটালেন। আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল রণাঙ্গনে পরিণত হলো। যুদ্ধের প্রয়োজনে পথ-ঘাট, বন্দর, বিমানঘাঁটি, সেতু, গুদামঘর প্রভৃতি নির্মাণের হিড়িক পড়ে গেল। হীরা, ইউরেনিয়াম, টিন, আকরিক দস্তা, কোবাল্ট, এ্যান্টিমনি, গ্রাফাইট, এ্যাজবেসটোজ ও কয়লা আহরণের পরিমাণ বাড়তে থাকল। যুদ্ধের ফলে আমদানি বিঘ্নিত হওয়ায় আফ্রিকায় বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প কাষ্ঠশিল্প ও খাদ্যশিল্পের প্রসার ঘটল। অন্যদিকে সোনা, লোহা, ম্যাংগানিজ, ক্রোমিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি রপ্তানি হ্রাস পেল। এই সময় আফ্রিকায় দারুণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটে এবং বহু শিল্প গড়ে ওঠার ফলে শিল্পায়নের গতি দ্রুততর হয় বলে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু তাঁদের এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। শিল্পের কিছুটা প্রসার ঘটে, নির্মাণকার্যও বেড়ে যায় এবং এর ফলে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয় বটে, কিন্তু আফ্রিকার মানুষের দুঃখদুর্দশা দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধে কমে না গিয়ে বেড়েই যায়।

বিদেশী শিল্পপতিরা মুনাফার পাহাড় গড়তে থাকেন, অথচ শ্রমিক ও অফিস কর্মীদের প্রকৃত মজুরী ও বেতন দারুণভাবে হ্রাস পায়। সৈন্যবাহিনীর এবং নিজেদের ঘাটতি মেটানোর জন্যে বিদেশী পুঁজিপতিরা প্রচুর খাদ্যশস্য ও মাংস কিনতে শুরু করার ফলে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এরই সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কারসাজিও শুরু হয়। আফ্রিকান চাষীদের কাছ থেকে এরা জলের দামে কৃষিজাত পণ্যাদি কিনে নেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ব্রিটিশ একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এই সময় প্রতিটন কোকোগুটি ১০ পাউণ্ড দরে কেনে, অথচ যুদ্ধের আগে এই কোকোগুটি কেনা হতো ৫০ পাউণ্ড টন দরে। চাষীদের শোষণ শুধু এতেই শেষ হয়নি, তাদের ব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্য বিক্রি করা হয় আগের দরের চেয়ে ১০০ থেকে ১৫০ শতাংশ বেশি দরে। এরই সঙ্গে বেগার প্রথার ব্যাপক প্রবর্তনের মাধ্যমে যে হাজার হাজার মেহনতী মানুষকে নানা ধরনের পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এই ধরণের শোষণের ফলে আফ্রিকার বিশাল অঞ্চল জুড়ে বহু লোক মহামারী ও অনশনে মারা যায়।

সমগ্র আফ্রিকা থেকে মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনীতে দশলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়া সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হয় প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক। উত্তর আফ্রিকা ছাড়াও কৃষ্ণ আফ্রিকার আবিসিনিয়া, সোমালিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের হাজার হাজার গেরিলা ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে। মিত্রপক্ষের আফ্রিকান বাহিনী

শুধু আফ্রিকাতেই লড়েনি, তারা লড়েছে পশ্চিম ইওরোপে, পশ্চিম এশিয়ায়, বারমা ও মালয়ে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মহাযুদ্ধের পরিণত হওয়ার ফলে যুদ্ধের চরিত্রের যে পরিবর্তন ঘটল তা আফ্রিকার জনগণের মনে গভীর ছাপ রেখে গেল। মুক্তিকামী সমস্ত মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় হলো তাদেরও মুক্তি আসন্ন হয়ে উঠেছে। ফ্যাসিস্ট কবল থেকে মুক্ত দেশগুলিই তাদের মনে এই প্রত্যয় জাগাল। ফ্যাসিস্টদের তীব্র জাতিদ্বেষী ও বর্ণদ্বেষী মনোভাবের কথা ও আফ্রিকার মানুষের অজানা ছিলনা, তাই হিটলারের তথা ফ্যাসিবাদের পতন তাদের মনে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। কৃষ্ণ আফ্রিকার মানুষ, বিশেষ করে, দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া প্রভৃতি দেশের মানুষ ধরেই নিল যে এবার জাতিদ্বেষ ও বর্ণদ্বেষের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, ফুরিয়ে এসেছে জাতিদ্বেষ বর্ণ-দ্বেষকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা উপনিবেশবাদী মতাদর্শ বা তত্ত্ব।

সমগ্র আফ্রিকা, বিশেষ করে কৃষ্ণ আফ্রিকার সমস্ত মুক্তিকামী মানুষ সেদিন তাকিয়ে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে। যে দেশে পুঁজিবাদের অবসান ঘটেছে, যে দেশে মানুষ মানুষকে আর শোষণ করেনা, যে দেশে জাতিদ্বেষ বর্ণদ্বেষের কোনো স্থান নেই, যে দেশে সমস্ত মানুষই ভাই ভাই, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সেই দেশের জনগণের আশ্চর্য বিস্ময়কর সংগ্রাম তাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল। তাই, সোভিয়েতের জয়কে তারা নিজেদেরই জয় বলে গ্রহণ করেছিল।

সেনেগালের রাজনৈতিক নেতা গ্যাব্রিয়েল দ'রবুশিয়ের লিখেছেন :

"আমার সেই যুদ্ধের মাসগুলি মনে পড়ছে যখন বেতার বহন করে নিয়ে গিয়েছিল আমাদের অরণ্য ও মরুভূমির সুদূরতম প্রান্তে আমাদের দরিদ্র গ্রামগুলি থেকে হাজার কিলোমিটার দূরবর্তী সোভিয়েত বাহিনীর জয়বার্তা। প্রত্যেকেই এই জয়বার্তাকে তাদের নিজেদের বাহিনীর জয় বলে আপনা থেকেই সানন্দে স্বাগত জানিয়েছিল।"

এবার আফ্রিকা সোচ্চার হয়ে উঠল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে। এক নতুন পরিস্থিতিতে নতুন উদ্যমে শুরু হলো আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রাম।

দিন বদলের পালা এসেছে বুঝে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি আগে থেকেই সতর্ক হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনেক গালভরা বুলি কপচিয়ে, কিছু কিছু শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা আফ্রিকার জনগণকে ভুলাতে চেয়েছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর তাদের চাতুরী ধরা পড়ে গেল।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের স্বরূপ উদঘাটিত হলো কয়েকটি ঘটনার ফলে। প্রথমত শাসনসংস্কারের রকম দেখে বোঝা গেল সম্রোজ্যবাদী শক্তিবর্গ তাদের উপনিবেশ-

গুলিতে তাদের শাসন বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ; দ্বিতীয়ত জাতিসংঘে নিজেদের বশম্বদ দেশগুলির সাহায্যে তাদের অভিভাবকত্বে শাসিত অঞ্চলগুলিতে (ম্যানডেট অঞ্চল) অছি ব্যবস্থার মাধ্যমে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখল, 'অছি ব্যবস্থা' কার্যত ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় পরিণত হলো ; তৃতীয়ত দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকার তার অভিভাবকত্বে শাসিত দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা (সামরিক) কুক্ষিগত করল। এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইয়োরোপের একাধিক দেশ সমাজতন্ত্রের পথ বেছে নেওয়ায় এবং এশিয়া একাধিক দেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে জগৎসভায় আসন লাভ করায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশগুলিকে আঁকড়ে রাখতে চাইল। তারা বিপুল পরিমাণে অর্থ লগ্নী করল, বিশেষ করে তৈল ও খনিজ প্রভৃতি আহরণ শিল্পে, কৃষির কয়েকটি যায়গায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্পেও পরিবহনে।

১৮৭০ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে ব্রিটেন আফ্রিকায় তার উপনিবেশ সমূহে প্রায় এক শত কোটি ডলার লগ্নী করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী দশ বছরের মধ্যেই ব্রিটেনের লগ্নীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৫ কোটি ডলার। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে আফ্রিকায় ফরাসি পুঁজিপতিদের লগ্নীর পরিমাণ ২ শত কোটি ফ্রাঁ (পুরাতন) থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৪ শত কোটি ফ্রাঁ অর্থাৎ দ্বিগুণ বাড়ে। ৫০-এর দশকের মাঝামাঝি আফ্রিকা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করে। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় উৎপাদিত নিম্নলিখিত পণ্যগুলির মোট পরিমাণের কত অংশ আফ্রিকার তা নীচে দেওয়া হলো :

হীরা—	৯৮ শতাংশ
কোবাল্ট—	৮০ „
সোনা—	৫৬ „
ক্রোমিয়াম—	৩৮ „
ম্যাংগানীজ—	৩৬ „
তামা—	২৭ „

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বাহ্নে (১৯৩৮) আফ্রিকা থেকে রপ্তানি করা পণ্যাদির মোট মূল্য ছিল একশত কোটি ডলার। ১৯৫৫ সালে রপ্তানি পণ্যের মোট মূল্য দাঁড়ায় ৫·৪৪ কোটি ডলার।

লগ্নী যত বাড়তে লাগল বিদেশী পুঁজিপতিদের মুনাফাও তত বাড়তে লাগল। ৫০ এর দশকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ৮৬ কোটি ডলার লগ্নী করে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা শতকরা

১৫ ডলার হারে বছরে ১৩ কোটি ডলার মুনাফা লোটেন। কোনো কোনো কোম্পানি এর চেয়েও বেশি হারে মুনাফা অর্জন করে। উত্তর রোডেশিয়ায় রোকানা কোম্পানির মুনাফা দাঁড়ায় লগ্নীকৃত অর্থের ২১২ শতাংশ।

যুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরাও সুযোগ বুঝে আফ্রিকায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বপ্রকার আক্রমণ চালিয়ে তারা আফ্রিকায় তাদের জায়গা করে নিল।

দেখতে দেখতে লগ্নী বৃদ্ধির হারের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। পাঁচ বছরে (১৯৫১-১৯৫৫) প্রত্যক্ষ মার্কিন লগ্নী ৩১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৭৯ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ আড়াই গুণেরও বেশি। বিশেষ-করে দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া, বেলজিয়ান কংগো এবং আরও কয়েকটি দেশে মার্কিন পুঁজি বেশ গভীরে শিকড় গাড়লো। এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাহন ছিল বিশ্ব ব্যাঙ্ক (পুনর্গঠন ও উন্নয়নের আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক)।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ আফ্রিকায় যখন জাঁকিয়ে বসার চেষ্টা শুরু করেছে ঠিক তখনই সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের কোটি কোটি মানুষ নতুন দিনের আলো দেখতে পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

মহাযুদ্ধের "ঝোড়ো হাওয়া"য় সব ওলটপালট হয়ে গেছে। চিরাচরিত জীবন ও জীবিকা পাল্টে গেছে। পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে দ্রুত গতিতে, নতুন নতুন শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের উদ্ভব হওয়ায় সেকালের আফ্রিকান সমাজের চেহারা বদলে গেছে। গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেছে শহরে শহরে জীবিকার্জনের আশায়। গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন ধরনের জাতীয় সংগঠন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দল ও গোষ্ঠীগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছে।

আজকের দিনে নতুন সমাজ গড়ে তোলার দায়ভার যাদের উপর ন্যস্ত, সেই শ্রমিকশ্রেণী প্রবল ও সুসংহত হয়ে উঠেছে। ৫০-এর দশকের মাঝামাঝি আফ্রিকায় শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় এক কোটিরও বেশি।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা আফ্রিকায়। ঘানা, নাইজেরিয়া ও অন্যান্য দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টি ও গোষ্ঠী গড়ে ওঠে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের কঠোর দমননীতি অগ্রাহ্য করে বেআইনী অবস্থার মধ্যে গণ-আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তুলতে থাকে।

এই সময় আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের জাতীয় ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে। আফ্রিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই সময় দেশীয় ধনিকশ্রেণী (জাতীয় বুর্জোয়া) আরও বড়ো অংশগ্রহণ করতে থাকলেও এই শ্রেণীর কাজ-কারবার সীমিত থাকে প্রধানত কৃষি, হস্তশিল্প, ছোট ছোট শিল্প-সংস্থা এবং খুচরা কারবারের মধ্যে। গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলি বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হওয়ায় সেসব ক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়ার প্রবেশাধিকার ছিলনা। এর ফলে যে তিক্ততা ও সংঘাতের সৃষ্টি হয় তা জাতীয় ধনিকশ্রেণীকে মুক্তি সংগ্রামের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করে।

ইতিমধ্যে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কিছুটা শিক্ষাবিস্তার ঘটায় নতুন এক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। দেশে ও বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণদের মধ্যে প্রগতিশীল একটি বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে। এঁদের মধ্যে থেকে মুক্তিসংগ্রামের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ প্যাট্রিস লুমুম্বা, ফেলিক্স্ মুসি, রুবেন উম নিয়োবে, জোমো কেনিয়াট্টা, কোয়ামে নক্রুমা প্রমুখ আবির্ভূত হন। প্রথমোক্ত তিনজনই সাম্রাজ্যবাদীদের দালালদের হাতে নিহত হন।

আফ্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনকালে আধুনিক শিল্পের কিছুটা বিস্তার ঘটার ফলে দেশীয় ধনিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। দুর্বল হলেও দেশীয় ধনিকশ্রেণী আফ্রিকার অর্থনৈতিক বিকাশে বেশ বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু কৃষি, ছোট ছোট শিল্পসংস্থা, কারুশিল্প এবং খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যেই তাদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ থাকে। এর ফলে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে দেশীয় ধনিকশ্রেণীর তীব্র বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন দেশীয় ধনিকশ্রেণী মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে বাধ্য হয়।

ঔপনিবেশিক অর্থব্যবস্থার প্রয়োজনে এবং জনসাধারণের চাপে আফ্রিকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং বহু ছাত্র বিদেশে পড়াশুনা করতে যায়। এইভাবে আফ্রিকান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্যাট্রিস লুমুম্বা, ফেলিক্স মুমি, রুবেন উম নিয়োবে, জোমো কেনিয়াট্টা ও কোয়ামে নক্রুমার নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রথম তিনজন উপনিবেশবাদীদের হাতে অথবা তাদের দালালদের হাতে নিহত হন। বুদ্ধিজীবীরা আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে ক্রমেই আরও বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকেন।

আফ্রিকার সমস্ত উপনিবেশে ও সংখ্যালঘু জাতিবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ শাসিত অঞ্চল-গুলিতে স্বাধীনতার, সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসনাধিকার ও জাতিবিদ্বেষী সরকারের অবসানের

দাবি ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটেনের ম্যানচেষ্টার শহরে অনুষ্ঠিত নিখিল আফ্রিকা কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে উল্লিখিত দাবিগুলি সমর্থিত হয়। এই কংগ্রেসে আফ্রিকার ঐক্য ও সংহতি প্রতিফলিত হয়। নিখিল আফ্রিকা কংগ্রেসের ৫ম অধিবেশন আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই প্রথম এই অধিবেশনে শুধু নিগ্রো আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ নন, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের জাতীয় সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও যোগ দেন।

সাম্রাজ্যবাদীরা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের "মুষ্টিমেয় উগ্রপন্থী" বলে উড়িয়ে দেবার করেছিল, বলেছিল "এদের সঙ্গে জনসাধারণের কোনো যোগ নেই", কিন্তু সারা আফ্রিকা জুড়ে যখন মুক্তি আন্দোলনের তরঙ্গ উঠল তখন ক্ষিপ্ত সাম্রাজ্যবাদীরা নির্মম দমননীতি অনুসরণ করে আন্দোলন ব্যর্থ করার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগল।

আন্দোলনের রূপ পরিস্থিতি অনুযায়ী একেক অঞ্চলে একেক রকম ছিল। কোথাও বিক্ষোভ সমাবেশ ও শাসক দেশের জন্যে বয়কট, কোথাও আইন অমান্য; কোথাও ব্যাপক ধর্মঘট ও গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ, আবার কোথাও বা সশস্ত্র সংগ্রাম।

সন্ত্রস্ত সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী এবার নতুন কৌশল অবলম্বন করল। তারা আফ্রিকান ধনিকশ্রেণীর একাংশকে তাদের বিভিন্ন শিল্পের অংশীদার করে নিল, কিছু সংখ্যক শিক্ষিত আফ্রিকানদের বড়ো বড়ো পদে নিয়োগ করল। এইভাবে তারা সামাজিক ভিত্তি প্রসারিত করতে উদ্যোগী হলো। এর ফলে বিদেশী পুঁজির সঙ্গে যুক্ত একটি নতুন আফ্রিকান 'এলিট' বা বাছাই করা 'মানুষের শ্রেণীর সৃষ্টি হলো। এই নবসৃষ্ট শ্রেণীর সাহায্যে এবং প্রশাসন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু কিছু সুবিধা দিয়ে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বজায় রাখার যে চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদীরা করে তার মধ্যে নয়া-উপনিবেশবাদের একটি রূপরেখা ফুটে ওঠে। ঘরে বাইরে অহরহ প্রচার করা হতে থাকে যে শাসকশক্তিগুলি "নিঃস্বার্থভাবে" উপনিবেশের জনগণের "কল্যাণ সাধনে" ব্রতী হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যেই শাসনসংস্কার করা হচ্ছে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন মুক্তি আন্দোলনের বান ডেকেছে, সে বন্যা রোধ করার ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের ছিলনা। তাই, ঔপনি-বেশিক শাসনব্যবস্থার ভাঙন অনিবার্য হয়ে উঠল। পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংধর্ষের দ্বিতীয় স্তরে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ আফ্রিকায় শুরু হয়েছিল সে আক্রমণ ও তা প্রতিহত করার সংগ্রামের কাহিনী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে। এই আক্রমণ আফ্রিকার মুক্তির পথ সুগম করেছিল।

১০

"আমরা সাগরপারের সমস্ত সৈন্য দেশে ফিরছি নতুন ধারণা নিয়ে। আমরা কিসের জন্যে লড়েছি তা আমাদের বলা হয়েছে—তা হলো স্বাধীনতা। আমরা স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই চাইনা।

—নাইজেরিয়ার স্বেচ্ছাসৈন্য থিও-আয়ুলা।

দেশে ফেরার আগে নাইজেরিয়ার থিও-আয়ুলা ১৯৪৫ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর পুনা থেকে হার্বার্ট মেকলের কাছে যে চিঠি লেখেন তাতে সমগ্র আফ্রিকার মনোভাব স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের দাবিতে সোচ্চার আফ্রিকাকে নানা কৌশলে ঠেকিয়ে রাখার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পুরাতন আফ্রিকাকে সমাজে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এই পরিবর্তন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করল।

প্রথমত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ কৃষ্ণ আফ্রিকায় শিক্ষার প্রসার ঘটাতে বাধ্য হওয়ায় শিক্ষিত আফ্রিকানদের সংখ্যা উল্লেখ্যভাবে বেড়ে গেল। আফ্রিকান ছাত্ররা বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পেল। তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশে শুধু নিজ নিজ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলনা, নতুন নতুন চিন্তাধারার সঙ্গেও তাদের পরিচয় ঘটল, ফলে মুক্তি আন্দোলনের চেহারাই বদলে গেল।

দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব, কাজের অভাব হাজার হাজার মানুষকে গ্রাম

ছেড়ে শহরে ছুটতে বাধ্য করেছিল। এর ফলে কৃষ্ণ আফ্রিকার স্বল্পসংখ্যক শহরে জনসংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। এর ফলে আফ্রিকার সমাজজীবন বিপর্যস্ত এবং সামাজিক কাঠামো ভেঙে গেল। ১৯৪৫ সালের পর আফ্রিকার শহরগুলিতে জনসংখ্যা কিভাবে বেড়ে গিয়েছিল তার দুএকটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে। ১৯৫০ সালে কংগোর রাজধানী লিওপোল্ডভিলের (বর্তমান কিনশাসা) লোকসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ২১ হাজার, ১৯৫৮ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ; নাইরোবির (কেনিয়া) লোকসংখ্যা ছিল ১৯৪৪ সালে ১লক্ষ ৮৯ হাজার, ১৯৬০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল আড়াই লক্ষ ; অ্যাংগোলার রাজধানী লুয়াণ্ডার লোকসংখ্যা ছিল ১৯৪০ সালে মাত্র ৬১ হাজার, ১৯৬০ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ২ লক্ষ ২০ হাজার।

হাজার হাজার ক্ষুধার্ত গরীব ও জমিহারা চাষী ও গ্রামের খেটে-খাওয়া মানুষ রুজি-রোজগারের আশায় শহরগুলিতে ভিড় করছে, শহরের উপকণ্ঠে দেখা দিচ্ছে অসংখ্য বস্তি—জনহীন, আলোহীন, সারি সারি খুপরি। মানুষের এই বাঁচার লড়াই তাকে প্রতিদিন বাঁচার তাগিদে নতুন করে সমাজ গড়ে তোলার পথ খুঁজতে বাধ্য করছে।

যেসব অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দারা বড়ো বড়ো জোত ও খামারের মালিক হয়ে বসে-ছিল সেসব অঞ্চলে যেমন রোডেশিয়া ও কেনিয়ায় আফ্রিকান চাষীরা শ্বেতাঙ্গ কৃষকদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার ফলে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। তাদের পক্ষে টিঁকে থাকার সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দিল। এ ছাড়া শ্বেতাঙ্গ বণিকদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে কতৃপক্ষ রপ্তানিযোগ্য এককসলী কৃষির উপর নির্ভর করতে আফ্রিকান চাষীদের বাধ্য করার তাদের সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বাজার এবং শ্বেতাঙ্গ বণিকদের মর্জির উপর নির্ভর করতে হতো। এর ফলে চাষীদের দুর্গতির অন্ত ছিলনা, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ বণিক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফা দিন দিন বেড়েই চলেছিল।

কৃষ্ণ আফ্রিকার এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সরকারি কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবী উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণী এবং ক্ষুব্ধ ও ক্ষুধিত সকল শ্রেণীর চাষী এই সময় পরস্পরের কাছাকাছি হলো। দেখতে দেখতে সমগ্র কৃষ্ণ আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। এই আন্দোলন সর্বত্র এক ধরনের ছিলনা। কোথাও সংবিধান বা আইনসঙ্গত আন্দোলন, কোথাও জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, আবার কোথাও বা একেবারে অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের আকারে এই আন্দোলন

দেখা দিল। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে আন্দোলনের প্রবল বন্যা সাম্রাজ্যবাদকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই মোটামুটিভাবে কৃষ্ণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের প্রকৃতি ও ধারা উপলব্ধি করা যাবে।

কৃষ্ণ আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদের বাঁধ ভেঙে মুক্তি আন্দোলনের প্লাবন প্রথম বয়ে গেল পশ্চিম আফ্রিকার ব্রিটিশ উপনিবেশ গোলড কোসট বা স্বর্ণ উপকূলে।

প্রথম দিকে আন্দোলন ছিল আইনসঙ্গত। শাসকশ্রেণীর অনুগৃহীত শিক্ষিত আফ্রিকান নেতারা ব্যবস্থাপক সভায় স্থান পেয়েছিলেন। তাঁরাই আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে কিছু কিছু দাবি আদায়ের চেষ্টা করেন। আইনসম্মত আন্দোলনের নেতারা ছিলেন প্রধানত আইনজীবী। শাসনসংস্কারের সামান্য দাবিও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় আফ্রিকান সামন্ত-নৃপতি ও সর্দাররা মানতে রাজী না হওয়ায় আন্দোলন তীব্র ও ব্যাপক হয়ে ওঠে। বুদ্ধিমান সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ছিঁটেফোঁটা অধিকার দিয়ে আন্দোলন প্রশমনের চেষ্টা করেন।

ব্রিটিশ পশ্চিম আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত আইনসম্মত আন্দোলনের প্রথম সাফল্য প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি করে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস আপস-রফার কর্মনীতি জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা নেতা কেমলি হেফোর্ডের মৃত্যুব পর কংগ্রেস ভেঙে যায। কিন্তু গণ-আন্দোবন অব্যাহত থাকে এবং ব্রিটিশ সরকাব কর্তৃক প্রত্যক্ষ কর প্রবর্তনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯২৯-৩০ সালের মহামন্দার পর কৃবিপণ্যের দাম আবার বাড়তে শুরু করলে ব্রিটিশ কোম্পানি-গুলি সঙ্ঘবদ্ধভাবে কমদরে কৃষিপণ্য ক্রয়ের চেষ্টা করলে আফ্রিকান চাষীরা ব্যাপকভাবে বয়কট-আন্দোলন চালিয়ে কোম্পানিগুলিকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করে। এর ফলে জনসাধারণের মনোবল বেড়ে যায়। রাজভয় দূর হয়।

স্বর্ণ উপকূলের অধিবাসীরা বিপুল সংখ্যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। শিল্প ও কৃষির প্রসার ঘটায় অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং শ্রমিকরা তাদের দাবি আদায়ের ধর্মঘট আন্দোলনে লিপ্ত হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত থাকায় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানোর জন্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে। নতুন সংবিধানের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। খ্যাতনামা আইনজীবী দানবোথা, বোজো টমসন, কোরসা প্রমুখ আফ্রিকান নেতারা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে ইংল্যাণ্ডের ম্যানচেষ্টার শহরে এক নিখিল আফ্রিকা

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে স্বর্ণ উপকূলের ডঃ কোয়ামে নক্রুমা প্রমুখ কয়েকজন তরুণ নেতা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ডঃ নক্রুমা রচিত উপনিবেশের শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা শীর্ষক একটি প্রস্তাবে গণআন্দোলন শুরু করার আহবান জানানো হয়। প্রস্তাবটি কংগ্রেসে গৃহীত হয়। ডঃ নক্রুমা অন্যান্য নেতাদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে দেশে ফিরে যান এবং অসাধারণ সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়ে অচির কালের মধ্যে দেশের অবিসম্বাদী নেতা রূপে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন।

১৯১৭ সালে "ঐক্যবদ্ধ স্বর্ণ উপকূল সভা" (ইউনাইটেড গোল্ড কোস্ট কনভেনশন) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপিত হয়। এই সংস্থা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানায়। জাতীয় ধনিকশ্রেণীর উপরের তলার লোকেরা এবং এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সমস্ত শ্রেণীর কিছু লোক এই সংস্থা গঠনে সাহায্য করেন। জনগণকে আন্দোলনের মধ্যে টেনে না এনে ব্রিটেনের সঙ্গে আপস-রফার মাধ্যমে ক্ষমতা লাভই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। সংস্থার নেতৃত্ব হাতে রাখার জন্যে ধনী কাষ্ঠব্যবসায়ী জর্জ আলফ্রেড গ্র্যাণ্টকে এই সংস্থার সভাপতি করা হয়। অন্যান্য কর্মকর্তাদেরও বেশির ভাগ ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন।

কিন্তু গণ-আন্দোলনের বন্যা রোধ করা গেলনা। জিনিসপত্রের চড়া দর জন-সাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল, যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈন্য তা তাদের প্রাপ্য টাকা না পেয়ে এবং বেকার থাকতে বাধ্য হয়ে ক্ষেপে উঠেছিল। ফলে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু হলো বিদেশী পণ্যবর্জন আন্দোলন। ধর্মঘটের ঢেউ উঠল সারা দেশে। ১৯৪৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি শান্তিপূর্ণ একটি গণ-মিছিল যখন লাট-ভবনের সামনে স্মারকলিপি পেশ করার জন্যে উপস্থিত হল তখন পুলিশ গুলিবর্ষণ করল। ফলে আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করল।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই অবস্থায় দক্ষিণপন্থী নেতাদের হাত করার উদ্দেশ্যে কিছু দাবি দাওয়া মেনে নিতে রাজী হলেন। দক্ষিণপন্থী নেতারা খুসী হয়ে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়ে এক ইস্তাহার প্রকাশ করলেন। এবার পূর্ণ উপকূল সভা বা কনভেনশনে ভাঙন ধরল। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে গঠিত হলো নতুন দল—কনভেনশন পিপলস্ পার্টি। ডঃ নক্রুমার নেতৃত্বে নতুন দল শুধু সাম্রাজ্যবাদও জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে নয় পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করল। ব্রিটিশ সরকারের নতুন সংবিধানের খসড়া নতুন দল ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কর্তৃক আহূত প্রতিনিধি সভায় প্রত্যাখ্যাত হলো। পাঁচ শতাধিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধভাবে অবিলম্বে

ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস বা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার দাবি করল। ব্রিটিশ সরকার এবং আফ্রিকান সামন্ত-নৃপতি ও সর্দাররা এই দাবি অগ্রাহ্য করায় কনভেনশন পার্টি আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানাল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসও আম হরতালের ডাক দিল।

১৯৫০ সালের ৮ জানুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট শুরু হলো এবং তারপরেই আরম্ভ হলো বিদেশী পণ্যবর্জন আন্দোলন। ডঃ নক্রুমা সহ কনভেনশন পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের বহু নেতাকে কারারুদ্ধ করা হলো। ফল হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। নতুন পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

কিছুটা সংশোধন করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নতুন সংবিধান চালু করলে কনভেনশন পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তাদের শক্তি ও জনপ্রিয়তার পরিচয় দিল। নতুন ব্রিটিশ লাট সাহেব অবস্থা গুরুতর বুঝে ডঃ নক্রুমাকে মুক্তি দিয়ে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করলেন। অবশেষে নতুন আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হবেন এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর ডঃ নক্রুমাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে আহ্বান করা হল। ১৯৫২ সালের ৫ মার্চ ডঃ নক্রুমা প্রধানমন্ত্রীর পদে বৃত হলেন। কিন্তু লড়াই থামল না। দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলির সাহায্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখতে চাইল। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অকস্মাৎ নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে স্বাধীনতাবাদীদের হটিয়ে দেওয়ার শেষ চেষ্টা করল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও দেশের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলি। কিন্তু এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে কনভেনশন পার্টি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানান। এবার ব্রিটিশ সরকার পিছু হটতে বাধ্য হলেন, নবনির্বাচিত আইনসভাকে জানানো হলো নতুন রাষ্ট্রের নতুন নামকরণ তাঁরা করতে পারেন এবং এই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষিত হবে ১৯৫৭ সালের ৬ মার্চ। ব্রিটিশ অছি ব্যবস্থার অধীন টোগোর পশ্চিমাংশ নতুন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে এ কথাও জানানো হলো (গণভোটের মাধ্যমে টোগোর অধিবাসীদের সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশ ঘানার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে)।

১৯৫৭ সালের ৬ মার্চ স্বর্ণ উপকূল তার প্রাচীন নাম ফিরে পেয়ে কৃষ্ণ আফ্রিকার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বিশ্বসভায় আসন গ্রহণ করে। ঘানার আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সাবধান হয়ে গিয়েছিল। সিয়েরা লিওন, গামবিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে তারা চরমপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি

পাওয়ার আগেই নরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে আপস করে তাঁদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। এর ফলে তাদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ বহুল পরিমাণে অক্ষুণ্ণ থাকে।

কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকায় যা সম্ভব হলো পূর্ব আফ্রিকায়, বিশেষ করে কেনিয়ায় তা সম্ভব হলোনা। কেনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীরা উদ্যোগী হয়ে শ্বেতাঙ্গ বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করায় কেনিয়ার পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ১৬,৭০০ বর্গমাইল ব্যাপী সর্বোৎকৃষ্ট জমি তুলে দেওয়া হয়েছিল মাত্র তিন হাজার শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দার হাতে। এদের কাছে আফ্রিকানরা ছিল 'অসভ্য', 'জানোয়ার'। ডাণ্ডা মেরে আফ্রিকানদের ঠাণ্ডা রাখাই ছিল এদের কর্মনীতি।

শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের বেশিরভাগই ছিল প্রাক্তন সৈনিক, সামরিক অফিসার এবং সেনাপতি। এদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫২ সালে প্রায় ৩০ হাজারে দাঁড়ায়। আফ্রিকানদের শোষণ করেই এইসব শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দারা বিত্তশালী হয়ে ওঠে। আফ্রিকানদের জমি কেড়ে নিয়ে এরা বিরাট বিরাট খামার গড়ে তোলে। শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের প্রথম দলের নেতা লর্ড ডেলামেয়ার একাই লক্ষাধিক একর সেরা জমি কুক্ষিগত করেন। এঁর মতো ভাগ্যবানদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত লর্ড ফ্রানসিস স্কটের মতো অভিজাত লোকেরাও। বাগিচা কোম্পানিগুলির হাতেও বিপুল পরিমাণ জমি তুলে দেওয়া হয়। ইস্ট আফ্রিকান সিণ্ডিকেট, আপল্যাণ্ডস্ অব ইস্ট আফ্রিকা সিণ্ডিকেট এবং গ্রোসান ফরেস্ট কনসেসন পায় যথাক্রমে ৩ লক্ষ ২০ হাজার, ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ও ২ লক্ষ একর। এই অবাধ লুণ্ঠনকে "আইনসম্মত" করার উদ্দেশ্যে পাশ করা হয় খাস জমি সংক্রান্ত (ক্রাউন ল্যাণ্ডস্) অর্ডিন্যান্স। বে-আইনী এই অর্ডিন্যান্সের বলে শুধু যে আফ্রিকানদের সমস্ত ভালো জমি থেকে চিরতরে বঞ্চিত করা হলো তাই নয়, জলের দরে সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর অঞ্চলের সেরা জমি বিপুল পরিমাণে (৭,৫০০ একর পর্যন্ত) জলের দরে (এক একর এক পেনির দরে) শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও পাকা করা হলো।

আফ্রিকানরা অনেক সহ্য করেছিল, কিন্তু জমি কেড়ে নিয়ে তাদের যখন অনুর্বর অঞ্চলে ঠেলে দেওয়া হলো লাখে লাখে, তখন আর তারা সহ্য করতে পারলনা। কেমন করে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল তা' একজন আফ্রিকান সর্দারের উক্তি থেকেই অনুমান করা যায়। সফররত জনৈক ব্রিটিশ রাজনীতিবিদকে আফ্রিকান সর্দার বলেছিলেন :

"যখন আপনার চোখের সামনেই কেউ আপনার ষাঁড়টা কেড়ে নিয়ে তার মাংসের খানা খায় তখন আপনার দুঃখ পাওয়ার অধিকার থাকে। কিন্তু কালক্রমে আপনি

ক্ষমা করতে ও ভুলে যেতে শেখেন। অবশ্য, কেউ আপনার জমি চুরি করলে আপনি ভুলতে পারেন না, কারণ দেশে যাবার সময় প্রতিটি ঘণ্টায় আপনার ক্ষতির কথা আপনার মনে পড়তে থাকে।”

বিক্ষোভ দেখা দিল প্রথমে কেনিয়ার বৃহত্তম উপজাতি কিকিউ-এর মধ্যে। কারণ, প্রধানতই কিকিউদের জমিই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের নির্মম শাসন ও শোষণের পাত্র হয়েছিল কিকিউরাই। যুগপৎ জাতিদ্বেষ ও আধুনিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কিকিউরাই সমগ্র কেনিয়াব জাতীয়-মুক্তিসংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিল।

আফ্রিকান শ্রমিকদের মজুরী এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেবার জন্যে শ্বেতাঙ্গ মালিকবা চেষ্টা করলে কেনিয়ায় শ্রমিক-বিক্ষোভ দেখা দেয়। নাইরোবির উপকণ্ঠে অনুষ্ঠিত এক সভায় মজুরী কমানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৯২১ সালের গ্রীষ্মকালে। এই সভাতেই কেনিয়ার বুদ্ধিজীবীদের প্রথম সংগঠন তরুণ কিকিউ সমিতি স্থাপিত হয়। সমিতি ব্যাপক প্রচার-আন্দোলনে নেমে পড়ে। সমিতির সভাপতি হ্যারি থুকুর নেতৃত্বে কেনিয়ায় প্রথম বিক্ষোভ-মিছিল বেরুলে পুলিস মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্যে গুলি চালায়, ফলে ১৫০ ব্যক্তি নিহত হয়। শহীদদের রক্তস্নাত কেনিয়া জেগে ওঠে। অন্যান্য উপজাতিও সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে।

উন্মত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কেনিয়ার সর্বপ্রকার আন্দোলন বন্ধ করার ব্যবস্থা করল। এমন কি বৈধ ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে লিপ্ত কিকিউ কেন্দ্রীয় সমিতির মতো সংগঠনের নেতাদেরও অন্তরীণ করা হলো। ১৯৪০ সালে সর্ববিধ প্রতিবাদ অবৈধ বলে ঘোষণা করে ব্রিটিশ বেনিয়ারা মুক্তি সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অর্থনৈতিক পরিবর্তন রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কিছুটা পরিবর্তন ঘটালো। শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের প্রভাব সত্ত্বেও সরকার আফ্রিকানদের কিছু কিছু অধিকার দিতে বাধ্য হলেন। এর সুযোগ গ্রহণ করে আফ্রিকানরা গড়ে তুললেন এক নতুন সংগঠন—কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়ন। এর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন জোমো কেনিয়াত্তা। এরপর দশকের গোড়ার দিকেই জোমো কেনিয়াত্তার নাম সারা কেনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

দেখতে দেখতে কেনিয়া আফ্রিকা ইউনিয়ন সমগ্র কেনিয়ার জাতীয় গণসংগঠনে পরিণত হলো। ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা দাঁড়াল লক্ষাধিক, সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হলো ৫০টি শাখা। এরই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করল। এবার নেমে এলো দমননীতির শাণিত খড়্গ। ১৯৫০ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে

অবৈধ ঘোষণা করে সমস্ত শ্রমিকনেতাকে গ্রেপ্তার করা হলো। এরপরেই আঘাত হানা হলো কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নের উপর। জোমো কেনিয়াত্তা থেকে আরম্ভ করে ছোট-বড়ো সব নেতাকেই আটক করা হলো। কিন্তু জাগ্রত কেনিয়ার জনগণ নিজেরাই নিজেদের সংগঠিত করে অস্ত্রধারণ করল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। শুরু হলো এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

১৯৫২ সালে বিদ্রোহ শুরু হলে ব্রিটিশ কতৃপক্ষ কেনিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। ১৯৫৩ সালের জুন মাসে কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করে দেশ জুড়ে ধর-পাকড় চালানো হয়।

"মাউ মাউ" বিদ্রোহ বলে খ্যাত কেনিয়ার জনগণের বিদ্রোহ দমন করতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর চারবছর সময় লাগে। সংঘর্ষে ১১ হাজারেরও বেশী আফ্রিকান নিহত হয় (এদের মধ্যে ৫০ জনের মতো শ্বেতাঙ্গ এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত ১,৭০০ কিকিউ আছে), ২০ হাজার লোককে বন্দী-শিবিরগুলিতে আটক রাখা হয় এবং ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫০১ জন কিকিউ ও এম্বু উপজাতির লোককে কড়া পাহারায় তথাকথিত নিরাপত্তা অঞ্চল সমূহে বাস করতে বাধ্য করা হয়।

কেনিয়ার জনগণের সংগ্রাম সারা আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ সরকার দমননীতি পরিহার করতে বাধ্য হয় এবং শাসনসংস্কারের মাধ্যমে কেনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। সীমিত শাসন-সংস্কার আফ্রিকানদের খুশী করতে পারল না, আফ্রিকানদের দ্বারা নির্বাচিত ৮ জন প্রতিনিধি ব্যাপকতর ভোটাধিকারের এবং জোমো কেনিয়াত্তা প্রমুখ নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দেবার দাবি জানালেন। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে হোলা বন্দীশিবিরে ১১ জন বন্দী নিহত হওয়ায় আবার দেশ জুড়ে বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের ঢেউ উঠল। শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার জোমো কেনিয়াত্তাকে মুক্তি দিতে এবং রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন। জোমো কেনিয়াত্তা প্রমুখের নেতৃত্বে গড়ে উঠল কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন (কানু)। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সমর্থনে বিচ্ছিন্নতাবাদী উপজাতি-নেতা ও বিভিন্ন এর গোষ্ঠীর বুরজোয়া বুদ্ধিজীবীরা কেনিয়া আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন (কাডু) নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা গঠন করলেন। নতুন সংবিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর উভয় সংগঠনের ১৪জন সদস্যকে নিয়ে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হলো, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতেই থেকে গেল। আবার দেশ জুড়ে বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের ঢেউ উঠল।

১৯৬৩ সালের মে মাসের নির্বাচনে কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন সংখ্যা-

পরিষ্ঠতা লাভ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভেদনীতি ব্যর্থ করে দিল। ১ জুন স্বায়ত্ত-শাসন ঘোষিত হওয়ার পর জোমো কেনিয়াত্তা প্রধানমন্ত্রীর পদে বৃত হলেন।

স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার কেনিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেন। ১৯৬৩ সালের ১২ ডিসেম্বর ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ও সার্বভৌম কেনিয়ার রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটল।

আফ্রিকায় ফ্রান্সের উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত করেছিল আলজেরিয়ার রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসী পদানত ভিসি সরকার বনাম স্বাধীনতাকামী দ্যগল সরকারের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ এবং আফ্রিকার ফরাসি উপনিবেশগুলির মুক্তিসংগ্রামে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সমর্থনও আফ্রিকার মুক্তি যোদ্ধাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

১৯৫৮ সালে অজস্র সমস্যা জর্জরিত ফ্রান্সকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দ্যগল যখন রাষ্ট্রতরীর হাল ধরলেন তখন তিনি সরাসরি ঘোষণা করলেন যে কৃষ্ণ আফ্রিকার যে, কোনো উপনিবেশ হয় পূর্ণ স্বাধীনতা আর না হয় ফরাসি "গোষ্ঠীর" অন্তর্ভুক্ত স্বশাসিত প্রজাতন্ত্ররূপে ফরাসি "গোষ্ঠীর" অন্তর্ভুক্ত থাকার অর্থ স্বশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির পররাষ্ট্র নীতি প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য অভিন্ন বিষয়ের দায়িত্ব ফ্রান্সের হাতে ন্যস্ত করা।

দ্যগলের ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে দম ফুরিয়ে আসা ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা। এ চেষ্টায় দ্যগল প্রথমদিকে বেশ সাফল্যলাভও করেছিলেন, কারণ অধিকাংশ উপনিবেশ দ্বিতীয় পথই বেছে নিয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত বাদ সাধলেন কৃষ্ণ আফ্রিকার বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং গিনির অবিসংবাদী নেতা সেকু তুরে।

সেকু তুরের নেতৃত্বে গিনির গণভোটে জনগণ গিনির পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিল। ১৯৫৯ সালে সেনেগাল ও ফরাসি সুদান মিলিত হয়ে মালি প্রজাতন্ত্র গঠন করল এবং ফরাসি গোষ্ঠীর মধ্যেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাল। ফরাসি সরকার এই দাবি মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব কার্যত লোপ পেল—আইভরি কোস্ট, নাইজার, দাহোমে ও ভোলটা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করল। তবে দ্যগলের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলোনা। কারণ সদ্যস্বাধীন বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র প্রায় পুরোপুরিভাবেই ফ্রান্সের সঙ্গে তাদের পুরাতন সম্পর্ক বজায় রাখল। অবশ্য ফরাসি অধিকৃত কৃষ্ণ আফ্রিকায় একেবারে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল এমন কথা মনে করলে ভুল হবে। ফরাসি নাগরিকত্ব অর্জন করেছিলেন প্রধানত তাঁদের নেতৃত্বে সমগ্র ফরাসি অধিকৃত আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক দলগুলিকে

নিয়ে 'আফ্রিকান গণতান্ত্রিক পরিষদ' (আর ডি এ বা রাসম্বল দেমোক্রাতিক আফ্রিকান) নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল। এই সংস্থার অনেক নেতাই ছিলেন নরমপন্থী। আর ডি এ-র প্রধান নেতা হুপুয়েত বোইনি একজন আফ্রিকান বাগিচা মালিক। ইনি ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং ফরাসি ইউনিয়নের মধ্যে থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লাভের জন্যে আন্দোলন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

প্রধানত নরমপন্থী নেতাদের দ্বারা পরিচালিত এই সংস্থাকেও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা সন্দেহের চোখে দেখতেন। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি এই সংস্থার দাবি সমর্থন করায় এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয় এবং ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আবিজানে আর ডি এ-র সদস্যদের মারপিট করা হলে হাঙ্গামা বাঁধে। হাঙ্গামার অজুহাতে বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কারাগারে নির্যাতন চালিয়ে তাঁদের মনোবল ভাঙার চেষ্টা চলে। এর ফলে সমগ্র আইভরি কোস্ট জুড়ে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। ফরাসি সৈন্যদের গুলিতে ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে শতাধিক লোক নিহত হয়। তিন হাজার লোককে কারারুদ্ধ করে বিক্ষোভ স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

এই দমন-পীড়ন সত্ত্বেও আর ডি এ-র নরমপন্থী নেতারা কয়েকটি শর্তে ফরাসি সরকারের সঙ্গে আপস করায় সংস্থার মধ্যে প্রবল বিরোধ দেখা দেয়। এরপর মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে শ্রমিকশ্রেণী। ফরাসি অধিকৃত কৃষ্ণ আফ্রিকায় ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের ভিত টলিয়ে দেয়। এ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টরা নতুন নতুন জাতীয় সংস্থা গড়ে তোলে। পূর্ণস্বাধীনতার দাবিতে ফরাসি অধিকৃত কৃষ্ণ আফ্রিকা সোচ্চার হয়ে ওঠে। আলজেরিয়ায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ফ্রান্সকে গুরুতর রাজনৈতিক সংঘর্ষের সম্মুখীন করে। এই পরিস্থিতিতেই দ্যগল তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তবে তাঁর গণভোট গ্রহণের প্রস্তাব আফ্রিকানরা সাগ্রহে গ্রহণ করেনি। তা ছাড়া গণভোটের রায় যাতে ফ্রান্সের অনুকূল হয় তার জন্যে ভীতিপ্রদর্শন থেকে আরম্ভ করে ব্যাপক কারচুপি কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। তথাপি দ্যগলের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি। তাতে প্রগতিশীল আফ্রিকান নেতারা ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে একটি শক্তিশালী যৌথ রাষ্ট্র গড়ে তোলার যে চেষ্টা করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে যায়। একমাত্র মালি ও ফরাসি সুদ স্বল্পকালের জন্যে একটি ফেডারেশন গঠন করে। আইভরি কোস্ট দাহোমে প্রভৃতি এই ফেডারেশনে যোগ দিতে রাজী হয়নি। এর ফলে আফ্রিকায় ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব এখনও বেশ প্রবল রয়ে গেছে। কৃষ্ণ আফ্রিকায় বিরাট

উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বেলজিয়াম। চারিপাশে যখন অন্যান্য শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটছে, একটির পর একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম আফ্রিকান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটছে তখনও বেলজিয়াম তার "কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের পিতার ন্যায় পালনের" দায়িত্ব ত্যাগ করতে রাজী হয়নি।

কংগোর বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে অভ্যস্ত বেলজিয়াম আরও বেশী করে পুঁজি লগ্নী করছিল। শুধু রবার, পামতেল ও ফলমূল উৎপাদনের কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে বেলজিয়াম পুঁজিপতিরা তুষ্ট থাকেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে খনি থেকে আহরণ করা হয় সোনা ও হীরা। ক্রমে বহু মূল্যবান ধাতু আহরণে বিপুল পরিমাণ লগ্নী করা হলো। এ সবের মধ্যে ছিল কোবল্ট, তামা, টিন, দস্তা প্রভৃতি। দেখতে দেখতে কংগোর কাটাংগা প্রদেশ এক বিরাট শিল্পাঞ্চলে পরিণত হলো, গড়ে উঠল কলকারখানা। আফ্রিকানদের জমি কেড়ে নিয়ে বিলি করে দেওয়া হলো বড বড কোম্পানির মধ্যে। বেলজিয়ানবাসীদের হাতেও তুলে দেওয়া হলো অনেক উৎকৃষ্ট জমি। এর ফলে গড়ে উঠল তুলা, কফি, কোকো প্রভৃতির বড বড বাগিচা, গবাদি পশুপালন প্রতিষ্ঠান এবং কাঁচা মাল ব্যবহারোপযোগী করার বহু কারখানা।

পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো হলো। রেলপথ প্রসারিত হলো, রাজপথ ও রেলপথের মধ্যে যে শিল্পাঞ্চল ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে নদী ও সামুদ্রিক বন্দরগুলির যোগ স্থাপিত হলো। এক কথায় প্রথম মহাযুদ্ধের পর বেলজিয়াম অধিকৃত কংগোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। এবার রাজনৈতিক পরিবর্তনও আসন্ন হয়ে উঠল।

বেলজিয়ান সরকারের নির্মম শাসন ও শোষণ অনেক দিন আগে থেকেই কংগোলীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ জাগিয়ে ছিল, স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহ মাঝে মাঝেই দেখা দিত কংগোলীদের চিরাচরিত রীতিনীতি ও সংস্কার বিরোধী বিদেশী সরকারের কার্যকলাপ এবং খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আন্দোলনের মধ্যে উপনিবেশবাদ-বিরোধী মনোভাব অভিব্যক্ত হতো। কিবাংগিবাদ, দক্ষিণ কংগোর নিগ্রো মিশন এবং পূর্বাঞ্চলের কিধাওয়ালা আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। সিমোনে কিবাংগু নামে একজন কংগোলী প্রটেষ্টাণ্ট যে ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন তার রাজনৈতিক চরিত্র সুপরিস্ফুট হলো আন্দোলনের "কংগো কংগোলীদের জন্যে"—এই রণধ্বনিতে। ১৯২১ সালে এই আন্দোলন শুরু হয় এবং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কৃষকদের জিজিয়া বা মাথাপিছু কর না দেওয়ার এবং চাষের জমি না বাড়ানোর জন্যে আহ্বান জানানো হয়। শুধু সত্যাগ্রহের মধ্যে এই আন্দোলন

সীমাবদ্ধ থাকেনি, স্থানে স্থানে সশস্ত্র বিদ্রোহও দেখা দিয়েছিল।

বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ নির্মম দলননীতি অনুসরণ করে আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিবাংগুকে প্রথমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, পরে মৃত্যুদণ্ড মকুব করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ৩০ বছর বন্দী জীবনযাপন করে কিবাংগুও কারাগারেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর আন্দোলন কংগোলীদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল, তাদের প্রতিরোধের সঙ্কল্প চূর্ণ করার কোনো ক্ষমতা আর বেলজিয়ান সরকারের ছিলনা।

১৯১৯ থেকে ১৯২৩ সালে কংগোর বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটে এবং এই সব বিদ্রোহ দমন করতে বেলজিয়াম সরকারকে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে কংগোয় গণবিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করে। এবার কিবাংগির বাগিচা শ্রমিকরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। বিদ্রোহ দমনে বহুসংখ্যক সৈন্য নিয়োগ করা হয়, অসম সংগ্রামে নিহত হয় শত শত কংগোলী। মাসাই এদেশে বার হাজার বিদ্রোহী সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে। কিন্তু উপযুক্ত সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাবে এইসব বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু ব্যর্থতার মধ্যেই নিহিত ছিল সাফল্যের কাজ। নিজেদের দুর্বলতা, ভুলভ্রান্তি অনুধাবন করে কংগোলীরা ক্রমে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কংগো হিটলার বিরোধী মিত্রশক্তির গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল সরবরাহের একটি একান্ত প্রয়োজনীয় উৎস হয়ে দাঁড়ায়। ইউরেনিয়াম, তামা, রবার প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন পণ্যের আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বা হ্রাস পাওয়ার সেইসব পণ্য উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠে। এ সব ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। বেলজিয়ামের সঙ্গে এ সময় কংগোর যোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বিপুল অর্থ লগ্নী করে কংগোয় ঘাঁটি গেড়ে বসে। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্থানে সামরিক ঘাঁটি, বিমানবন্দর রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মিত হয়। এককথায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কংগোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক পরিবর্তন ঘটায়। কংগোলী জনগণের মনে এক নতুন চেতনা জাগে।

জীবনযাত্রার মান নামতে থাকায় এবং শ্রমিক ও কৃষকদের উপর শোষণ তীব্রতর হওয়ায় অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। স্থানে স্থানে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটতে থাকে। বিক্ষোভ দমনের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কঠোর দমননীতি অনুসরণ করে। সরকারি হিসাবেই জানা যায় (খুবই কম করে দেখানো হয়) রাজনৈতিক কারণে তিন হাজার

কংগোলীকে আটক রাখা হয়। কিন্তু এর ফল হয় বিপরীত। প্রবল বিক্ষোভ অনেক জায়গাতেই সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করে। এক বোবিলাভিনে প্রদেশেই ১৯৪০-১৯৪১ সালের মধ্যে সামরিক আইন জারি করতে হয়। ১৯৪৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মাসাই প্রদেশের লুলুয়াবুর্গ রক্ষীবাহিনীর কংগোলী সৈন্যরা বিদ্রোহ করে। সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে কর্তৃপক্ষ এই বিদ্রোহ দমন করে এবং হাজার হাজার কংগোলীর সামনে ১০০ জন বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়।

১৯৪১ সালে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের সঙ্গে কংগোলী শ্রমিকরাও তাদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

মহাযুদ্ধের অবসান ঘটার পর বেলজিয়ান সরকার সমগ্র কংগোর বিপুল সম্পদ পুরোপুরি কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে এক দশখানা পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রধান সহায় হয় মার্কিন ধনপতিরা।

এদিকে দেশ জুড়ে শুরু হয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। নবজাত শ্রমিকশ্রেণী, কংগোলী ধনিকশ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবীরা এই আন্দোলনে বিশেষ অংশগ্রহণ করে। কংগোয় ক্যাথলিক গীর্জার প্রভাব ছিল আফ্রিকার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। ১৯৪৬ সালের আগে পর্যন্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ক্যাথলিক পাদ্রীদের কুক্ষিগত ছিল। এর ফলে শতকবা ৯০ জনেরও বেশী লোক নিরক্ষব থেকে গিয়েছিল। মুক্তি আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে ক্যাথলিক পাদ্রীরা সতর্ক হলেন। তাঁরা কংগোলীদের মধ্যে থেকে পাদ্রী নিযোগ কবতে লাগলেন এবং এর জন্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তারের উপর নজর দেওয়া হলো! ১৯৫৪ সালে লিওপোলভড়িলে কংগোর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায কংগোলীবা উচ্চশিক্ষা লাভেব সুযোগ পেল।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠছে দেশে কর্তৃপক্ষ সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন নিষিদ্ধ করে দিলেও সমাজ-কল্যাণ-মূলক সংগঠন গডার অনুমতি দিয়েছিল। কালক্রমে বহু সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের দাবিতে রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত হয়। এগুলির মধ্যে যা কংগোর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আবাকো সারা দেশে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। এই আবাকোই ১৯৫৬ সালে প্রথম রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি জানায়। আবাকোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিভিন্ন উপজাতিভিত্তিক সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবী সমিতি রাজনৈতিক দাবি জানাতে পারে। ফলে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দল ও সংগঠন গড়ে ওঠে।

১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আফ্রিকার খ্যাতনামা দেশপ্রেমিক প্যাট্রিস

লুমুম্বার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত "কংগোলী জাতীয় আন্দোলন" নামক সংগঠন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

আক্রায় আফ্রিকান জাতিসমূহের সম্মেলনে প্যাট্রিস লুমুম্বা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন :

"আমাদের আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হলো ঔপনিবেশিক শাসন থেকে কংগোলী জনগণকে মুক্ত করা এবং স্বাধীনতা অর্জন করা।"

ভাষণ শেষ হলে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় : "উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, জাতিবাদ ও উপজাতিবাদ ধ্বংস হোক! চিরজীবী হোক কংগোলী-জাতি, চিরজীবী হোক স্বাধীন আফ্রিকা!"

কংগোর স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রবল আকার ধারণ করল। বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষও রুদ্রমূর্তি ধরল। আক্রা সম্মেলনের বিষয় আলোচনার জন্যে আবাকোতে আহূত সভা নিষিদ্ধ করা হলে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে লিওপোলডভিলে ১৯৫৯ সালের ৪ জানুয়ারি এক বিরাট মিছিল বেরোলে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। বিক্ষুব্ধ হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষে শত শত লোক হতাহত ও পঙ্গু হয়। সমস্ত সন্ত্রাস উপেক্ষা করে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। শ্রমিক-শ্রেণী সংগঠিতভাবে সংগ্রামে নেমে পড়ে, ধর্মঘটের ঢেউ ওঠে সারা দেশে।

বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠছে দেখে সুর নরম করে শাসন-সংস্কার এমন কি স্বাধীনতা দেওয়ারও আশ্বাস দেয়: কিন্তু ভিতরে ভিতরে মুক্তি আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির জন্যে চক্রান্ত করতে থাকে। বেলজিয়ান ধনপতিরা বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষের সমর্থক দলগুলিকে দু'হাতে টাকা বিলিয়ে প্যাট্রিস লুমুম্বার সমর্থকদের হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয় এবং প্যাট্রিস লুমুম্বা প্রভৃতি জাতীয় নেতাদের মুক্তি দিয়ে ব্রুসেল্‌স্‌-এ এক গোলটেবিল বৈঠক ডেকে বেলজিয়ান সরকার একটা আপসের সূত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। লুমুম্বা-বিরোধী দলগুলির প্রবল বাধা দান সত্ত্বেও প্রগতিশীল দলগুলিই জয়ী হয় এবং বেলজিয়ান সরকার ১৯৬০ সালের ৩০ জুন কংগোর স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সমর্থনপুষ্ট বেলজিয়ান সরকারের প্রতিশ্রুতি পালনের কোনো ইচ্ছা ছিলনা। তাই সুপরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে দেওয়া হলো।

এসব সত্ত্বেও বেলজিয়ান সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত কংগো প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সংবিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্যাট্রিস লুমুম্বার নেতৃত্বে পরিচালিত কংগোলী জাতীয় দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো। কিন্তু বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষের চক্রান্ত সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করা সম্ভব হলোনা। উপজাতি অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিরোধী ও বিভেদকামী দলগুলির ৮০ জন প্রতিনিধি নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রগতিশীল দলগুলির সামনে বড়ো রকমের বাধা সৃষ্টি করলো।

তবু প্যাট্রিস লুমুম্বা দমলেন না। সার্বভৌম ও স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের দাবিতে তাঁর দল সোচ্চার হয়ে উঠলো। প্যাট্রিস লুমুম্বা নব-নির্বাচিত সংসদে প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় বেলজিয়ান সরকার মুস্কিলে পড়ে গেলেন। শেষপর্যন্ত কংগোর স্বাধীনতা ঘোষিত হলো ১৯৬০ সালের ৩০ জুন।

স্বাধীনতা ঘোষণাকালে লুমুম্বার দৃপ্ত ও অকপট ভাষণ সাম্রাজ্যবাদীদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিল। এবার চক্রান্ত আরও জাঁকিয়ে উঠল।

স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার কয়েকদিন পরেই কংগোলী সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে এই অজুহাতে বেলজিয়াম সরাসরি হস্তক্ষেপ করলো। কাটাংগা প্রদেশ বেলজিয়ামের উসকানিতে মোইসে সোকচের নেতৃত্বে 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। কাম্বাই প্রদেশেও বেলজিয়ান দালালরা 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করে লুমুম্বা সমর্থকদের খতম করতে নেমে পড়ল।

এই অবস্থার মধ্যেও লুমুম্বা সরকার একাধিক প্রগতিশীল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং দেশপ্রেমিকদের সাহায্যে সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি আর কোনো উপায় না দেখে লুমুম্বা সরকারকে উৎখাত করার জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত হলো। গণতন্ত্রীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব, সংগঠনের দুর্বলতা এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগের অভাব চক্রান্তকারীদের পথ সুগম করল।

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে রাষ্ট্রপতি কাসাবুবু (নরমপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে) হঠাৎ লুমুম্বা সরকারকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু এরই সঙ্গে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন কর্ণেল মোবুতুর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনীর আকস্মিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে লুমুম্বা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হলো। এরপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের জঘন্য চক্রান্ত, জাতিসংঘ বাহিনীর

জ্ঞাতসারে প্যাট্রিস লুমুম্বা ও সহকর্মীদের ঘাতক শোষকের হাতে অর্পণ করা এবং ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁদের হত্যা কংগোর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক মসীলিপ্ত অধ্যায়। আজও এর জের চলেছে। মোবুতু শাসিত জাইরে (বেলজিয়ান-কংগোর বর্তমান নাম) আজও আফ্রিকার এক বিপদস্বরূপ।

কৃষ্ণ আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। তারই একটি রূপরেখা এখানে তুলে ধরা হলো। বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্রোত আফ্রিকা মহাদেশে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছে তা আজও দূর করা সম্ভব হয়নি।

বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যখন নবজাগ্রত কৃষ্ণ আফ্রিকার সামনে পিছু হটতে বাধ্য হলো তখনও আফ্রিকায় প্রথম যারা পদার্পণ করেছিল তারা বহাল তবিয়তেই তাদের শাসন ও শোষণ চালিয়ে যেতে লাগল। স্পেনের পর পর্তুগালে ফ্যাসিষ্টচক্র ক্ষমতাসীন হয়েছিল। সালাজারের নেতৃত্বে এবং ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণ সমর্থনে পর্তুগাল তার উপনিবেশগুলি শুধু যে বজায় রাখতে সমর্থ হলো তাই নয়, আরও পাকাপোক্ত হয়ে বসতে উদ্যোগী হলো। *

কৃষ্ণ আফ্রিকায় বহু স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটায় আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পর্তুগীজ অধিকৃত উপনিবেশগুলি দক্ষিণ আফ্রিকাও রোডেশিয়ার লাগোয়া; কাজেই পর্তুগীজ আফ্রিকার সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই ফ্যাসিষ্ট সালাজার সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ পর্তুগীজ আফ্রিকার জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তার ফল হলো উল্টো। ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা পিছনে ঘোরানো গেলনা।

পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী পর্তুগালে শিক্ষালাভ করতে গিয়ে ইয়োরোপের নতুন নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হলেন। দেশের মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে শেষপর্যন্ত তাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে আলোকিত পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল বিশাল ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা এক সুসমন্বিত কর্মধারা অনুসরণ করতে পেরেছিলেন। তাই সমগ্র পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকায় একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে ঐক্যবদ্ধ মুক্তি

---

* আফ্রিকায় পর্তুগালের উপনিবেশগুলির মধ্যে ছিল মোজাম্বিক, আংগোলা, গিনি-বিসাউ ও কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জ, সাও তোম (সেন্ট টমাস) দ্বীপ ও প্রিনচেপে দ্বীপ। এগুলির মোট আয়তন ২০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারেও বেশি, লোকসংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষাধিক।

আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। যাঁরা এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলেন তাঁদের মধ্যে আমিলকার কাব্রালের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই তার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত গিনি-বিসাউ ও কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস দিয়েই পর্তুগীজ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস শুরু করা হয়েছে।

গিনি-বিসাউ ও কেপভারদে দ্বীপপুঞ্জ

সেনেগাল ও ফরাসি অধিকৃত গিনির মধ্যবর্তী পর্তুগীজ অধিকৃত গিনি (বর্তমান নাম বিসাউ বা গিনি-বিসাউ) প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলবর্তী তিনটি দ্বীপ –বালাম, কোমো ও কাটিন। মোট আয়তন ১৩,৯৪৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ৭১ হাজার।

পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলভাগ থেকে প্রায় ৬ শত কিলোমিটার দূরে আতলান্তিক মহাসাগবেব দশটি বড় এবং পাঁচটি ছোট দ্বীপ পর্তুগীজরা আবিষ্কাব করে ১৫শ শতাব্দীব মধ্যভাগে। এইসব দ্বীপেব নাম দেওয়া হয় কেপ ভাবদে দ্বীপপুঞ্জ। গিনি বিসাউ-এর মুক্তি যোদ্ধাদেব সঙ্গে এবং একই দলেব নেতৃত্বাধীন কেপ ভারদের তিন লক্ষ মানুষ পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে লডাই চালিয়ে ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা অর্জন কবে। কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জ একটি স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ কবে। এব বাজধানীব নাম প্রাওয়া।

কেপ ভাবদে দ্বীপপুঞ্জেব আযতন ১, ৫৫৭ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৯৯ হাজাব।

১১

"আপনারা জানেন যে পর্তুগীজ আইনে ইউনিয়নগুলির ধর্মঘট করার অধিকার ছিলনা—ধর্মঘট সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কাজেই পর্তুগীজরা যখন ধর্মঘটের সম্মুখীন হলো (১৯৫৯ সালের অগস্ট মাসে বিসাউ-এর রাজধানী রিও গ্রানদের পিজিগুইটি বন্দরে ডক শ্রমিকরা বে-আইনী নির্দেশের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে) তখন পর্তুগীজদের কাছে পরিস্থিতি একেবারে নতুন ঠেকল। তাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হলো তা হলো আতঙ্ক। তারা ফৌজ তলব করল। ফৌজ ডকে হাজির হয়ে কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করেই গুলি চালাতে শুরু করল। ফলে প্রায় ৫০ জন নিহত ও শতাধিক লোক আহত হলো। আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো, কিন্তু রাত্রিকালে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিটাই ভুল হয়েছে। শহরগুলিতে ধর্মঘট বা হরতালের মতো কোনোরকম গণতান্ত্রিক কার্যক্রম শুরু করা অর্থহীন······একটি মাত্র কাজ হলো··· একটি বন্দুক যোগাড় করা।"

—উফা হাম্ (ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিল কার্নানডেজ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার)

আফ্রিকার পশ্চিমপ্রান্তে আতলান্তিক মহাসাগরের উপকূলে বেশ কয়েকটি দ্বীপ পর্তুগীজরা দখল করেছিল অনেক দিন আগে। অধিকৃত এইসব দ্বীপ পর্তুগীজ গিনি এবং কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত হয়। আরও দূরে সাওতোম ও

প্রিন্‌চেপে দ্বীপ*। এইসব দ্বীপও পর্তুগীজরা দখল করেছিল। সব দ্বীপেরই নামকরণ করে পর্তুগীজরা।

পর্তুগীজ গিনি এবং কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জ পর্তুগীজরা বেশী সংখ্যায় বসতি করেনি এবং বাগিচা গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি। তারা ছোট ছোট জোতের চাষীদের চীনাবাদাম চাষ করতে বাধ্য করে। এ অঞ্চলের রপ্তানি পণ্যের ৭০ শতাংশই ছিল চীনাবাদাম। কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জে অধিকাংশ আফ্রিকান অধিবাসীর কোনো জমি ছিলনা। তারা পর্তুগীজ জমিদারদের ক্ষেতখামারে কাজ করতে বাধ্য হতো অথবা মোটা টাকা দিয়ে জমি ইজারা নিয়ে চাষবাস করত। অনেকে কেপ ছেড়ে চলে যেত অন্য দেশে কাজের সন্ধানে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে বেশিরভাগ লোক যেত আমেরিকায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহিরাগতদের জন্যে 'কোটা' ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পর আমেরিকায় যাওয়ার হিড়িক কমে যায়। তখন থেকে কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জ আফ্রিকার অন্যান্য দেশের বিদেশী বাগিচা মালিক ও খনি মালিকদের সস্তা শ্রমিক সরবরাহের পার্টিতে পরিণত হয়।

পর্তুগীজদের নির্মম শোষণ দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকে। সস্তায় গরীব চাষীদের কৃষিজাত পণ্য কিনে এবং চড়াদরে তাদের কাছে কাপড় ও অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য বিক্রয় করার সুপরিচিত শোষণের পদ্ধতি অনুসরণ করা ছাড়াও পর্তুগীজরা করভারে আফ্রিকানদের জর্জরিত করে। আয়ের পরিমাণ সামান্য, তা থেকে ২৫ শতাংশ কর দেওয়ার পর আফ্রিকান পরিবারগুলির অর্ধাশনে অনশনে দিন কাটানো ছাড়া উপায় ছিলনা।

আফ্রিকানদের শোষণের ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বড়ো বড়ো পর্তুগীজ কোম্পানি। তেল, নুন, চীনাবাদাম প্রভৃতির কারবারে এদের ছিল একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু পর্তুগীজ পুঁজিপতি ও বণিকদের টাকার জোর না থাকার বেশীর-ভাগ পুঁজিই লগ্নী করে ব্রিটিশ, মার্কিন, ফরাসি ও জাপানি পুঁজিপতিরা। গিনিতে তৈলের জন্যে বিশাল ভূখণ্ডে সন্ধান কার্য চালানোর একচেটিয়া অধিকার পায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল। এই কোম্পানি ১৫ লক্ষ ডলার প্রাথমিক পুঁজি সহ এসো এক্সপ্লোরেশন গিনি নামে একটি শাখা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে।

অবাধ শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে পর্তুগীজ গিনি ও কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। পাঁচ শত বৎসরের পর্তুগীজ

* সাও তোম (সেণ্ট টমাস) প্রিনচেপে দ্বীপ: আয়তন ৪ শত বর্গমাইল লোকসংখ্যা—৬৭ হাজার।

শাসনে শতকরা ৯৯ জনই নিরক্ষর থেকে যায়, ১১ মাস বয়স হতে না হতেই হাজারে ১৮০ থেকে ২০০ শিশুর মৃত্যু ঘটতে থাকে, চিকিৎসা ও চিকিৎসক বলতে কি বোঝায় তা অধিকাংশ মানুষেরই অজানা থেকে যায়, অর্ধাশনে অনশনে মৃত্যু একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে ওঠে। আফ্রিকার পর্তুগালের সমস্ত উপনিবেশের মধ্যে গিনি বিসাউ ছিল সব চেয়ে অনগ্রসর। আতলান্তিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী ৩৬ হাজার ১ শত বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই দেশটির খনিজ সম্পদ আহরণের কোনো চেষ্টা পর্তুগীজরা করেনি। এখানে বক্সাইট আছে, আকরিক লোহা আছে, তেল ও গ্যাসের সন্ধানও পাওয়া গেছে। বিদেশী পুঁজিপতিদের দৃষ্টি এই দেশের উপর না পড়ায় বিদেশী পুঁজির আধিপত্যও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নিতান্তই কৃষিনির্ভর গিনি বিসাউ-এর আবাদী জমির ৯৫ শতাংশই ছোট ছোট জোতে বিভক্ত। দরিদ্র ছোট চাষীরা প্রধানত ধান ও অন্যান্য চাষ করে কোনোরকম জীবিকার্জন করত। সমুদ্র, নদী, নালায় মাছ যথেষ্ট এবং জনসাধারণের একটি অংশ মাছ ধরে জীবিকার্জন করত। পশুপালন ব্যবস্থা মোটেই উন্নত নয় ফলে আয়ও বেশী হয়না। ধানভানা কল, করাত কল এবং চীনাবাদাম প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগী করার কলগুলির মধ্যেই গিনি বিসাউ-এর শিল্প সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের তালিকায় ছিল চীনেবাদাম, পাম তেল, কাঠ, চামড়া, রবার, মাছ এবং কুমীরের চামড়া।

গিনি বিসাউ-এ কোনো রেলপথ নেই। পরিবহণের জন্যে নির্ভর করতে হয় মোটর ও লরির উপর। কাঁচা ও পাকা দুরকম রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য মাত্র ৩,৫০০ কিলোমিটার, আর নৌবাহ্য নদীপথের দৈর্ঘ ১,২৫০ কিলোমিটার।

গিনি বিসাউ-এ উপকূলভাগে জাহাজ চলাচলের, বিশেষ করে মালবাহী জাহাজ চলাচলের সুব্যবস্থা ছিল। দুটি প্রধান বন্দর হলো বিসাউ ও বোলামা। বিসাউ-এ একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর গড়ে তোলা হয়।

গিনি বিসাউ-এর অনগ্রসরতার স্পষ্ট ছবি উল্লিখিত বিবরণ থেকেই পাওয়া যায়। এই অনগ্রসরতা গিনি বিসাউ-এর মুক্তি সংগ্রামে কিছুটা সাহায্য করেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আধুনিক সৈন্যবাহিনীর পথে দুর্গম গিনি-বিসাউ অঞ্চলে যুদ্ধ চালানো একরকম অসম্ভব ছিল বললেই হয়। এ ছাড়া দীর্ঘ সমুদ্রপথে যোগাযোগ রক্ষা করে ছড়িয়ে থাকা দ্বীপগুলিতে আক্রমণ চালানো পর্তুগীজদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যখন এশিয়া চঞ্চল হয়ে উঠেছে; যখন ভারতবর্ষ,

চীন, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠছে, তখন আফ্রিকার মানুষরাও চঞ্চল হয়ে উঠল। ১৯০৮ সালে পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটল গিনির বোলামা দ্বীপে। মূল ভূখণ্ডে ছড়িয়ে গেল এই বিদ্রোহের আগুন। ১৯১৬ সালের আগে এ আগুন পর্তুগীজরা নেভাতে পারেনি। আবার ১৯১৭, ১৯২৫ ও ১৯৩৬ সালে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে গিনিতে।

কিন্তু এসব বিদ্রোহ স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ, পুরাতন ও পরিচিত সমাজের কাঠামোর উপর বিদেশী উপনিবেশবাদের আক্রমণের এবং নতুনভাবে গড়ে উঠতে থাকা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ। পরদেশী শোষণ ও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ জনগণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল না।

ইতিমধ্যে পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে নতুন এক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল। হাজার হাজার সর্বহারা মানুষ রুজি-রোজগারের আশায় শহরগুলিতে ভিড় করেছিল, জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে হাজার হাজার লোক নিজেদের চিরাচরিত জীবন-যাত্রা ও গ্রামগুলি ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল পার্শ্ববর্তী ব্রিটিশ ও ফরাসি উপনিবেশ-গুলিতে, গড়ে উঠেছিল শ্রমিকশ্রেণী আর এরই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল ক্ষুদ্র একটি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। তখন এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী কোনো পথের নিশানা পাননি। নতুন চিন্তাধারার স্রোত বইতে শুরু করেছে, অসন্তোষ বিক্ষোভ জেগেছে; কিন্তু ফ্যাসিস্ট শাসনে সে চিন্তাধারা প্রকাশ করা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। তবু চুপ করে থাকতে পারলেন না আফ্রিকার এই নবজাত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন এঁদের অনেকেই; জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের খ্যাতিমান ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারতেন। কিন্তু মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়, দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় পাগল এই সব বুদ্ধিজীবী চুপ করে থাকতে পারলেন না। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, তাঁরা সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, তাঁদের কথা সাধারণ মানুষ বোঝেনা, তাঁদের ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান।

পুরাতন আইনসম্মত পথে পর্তুগীজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনুসরণ করে যাঁরা দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁদের ব্যর্থতা বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর চোখ দিয়েছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন এ পথে এগিয়ে যাওয়া যাবেনা। প্রথমত, এই পথ জনগণের ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে দেবে ছাড়া কমাবে না। দ্বিতীয়ত, পর্তুগীজ

সরকার এই পথও অনুসরণ করতে দেবেনা। পর্তুগীজদের সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের কারাদণ্ড দিয়ে একথা পর্তুগীজ সরকার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ তখন ব্রিটিশ ও ফরাসি উপনিবেশগুলিতে শুরু হয়ে গেছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, অনুষ্ঠিত হচ্ছে সভাসমিতি, রাজপথে মিছিলে মিছিলে উঠছে কলরোল গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার দাবিতে। অথচ পর্তুগীজ-অধিকৃত আফ্রিকা যে তিমিরে সেই তিমিরে। আদিগন্তবিস্তৃত এই তিমিরান্ধকারের মধ্যে একটা বিদ্যুতের ঝলক দেখা গেল। আংগোলার তরুণ কবি ভিরিয়াতো দি ক্রুজের উদ্যোগে প্রকাশিত হলো একটি কবিতা পত্রিকা, নাম 'মেনসাজেস (মেসেজ বা বাণী)। পর্তুগীজ ভাষায় প্রকাশিত এই কবিতা-পাত্রিকা বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া জাগালো এই পত্রিকার শিরোদেশে লেখা থাকত 'এসো, আমরা আংগোলাকে আবিষ্কার করি'। আফ্রিকান 'বর্বরদের' এই আত্মস্থ হওয়ার, নিজেদের দেশকে নতুন করে আবিষ্কারের চেষ্টা পর্তুগীজ সরকার বরদাস্ত করতে পারল না। দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পরেই ছাপার অনুমতি প্রত্যাহৃত হলো।

"পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা নয়, আফ্রিকার নিজস্ব সভ্যতার দিকে ফিরে তাকাও, দেশের দিকে ফিবে তাকাও"—লুয়ানডার কবি বুদ্ধিজীবীদের এই বাণী আফ্রিকান বুদ্ধিজীবী-মহলে যে সাড়া জাগিয়েছিল তা বৃথা হয়নি। লিসবনের ক্ষুদ্র আফ্রিকান বুদ্ধিজীবী-গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন ভাবনা একটা স্পষ্ট রূপ লাভ করতে লাগল। এই গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন আমিলকার কাব্রাল, অগস্তিনো নেতো, মারিও দি আনদ্রেদ, ফ্রানসিস্কো তেনরেইরো প্রমুখ পরবর্তীকালের খ্যাতনামা নেতারা। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আফ্রিকার অন্যান্য দেশের আরও অনেক বুদ্ধিজীবী।

৫০-এর দশকে এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী—সাহেব নয়, পরানুকরণপ্রিয় নয়, আত্মস্থ আফ্রিকান রূপে আত্মপ্রকাশ করার জন্যে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু পর্তুগীজ শাসনে এ কাজ সহজসাধ্য ছিলনা। তাই অনেক বিবেচনার পর এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী আফ্রিকান সংস্কৃতি অনুশীলনের উদ্দেশ্যে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করলেন। পর্তুগীজ সরকার এতে কোনো আপত্তি জানালেন না। অবশ্য দুবছর পরে তাঁদের চেতনা হলো। তাঁরা কেন্দ্রটি বন্ধ করে দিলেন। তখন আফ্রিকান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই গবেষণাকেন্দ্র জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন করেছে।

শুধু এই গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলে লিসবনের আফ্রিকান বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী সন্তুষ্ট থাকেন নি, তাঁরা বুঝেছিলেন যে নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন চালিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের এবং বৈধ উপায়ে দেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা

একেবারে সংস্কারবাদী পথ অনুসরণ করে ফল হবেনা। ইয়োরোপের নতুন নতুন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁরা নতুন পথের সন্ধান করতে লাগলেন। নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে এমন কোনো বৈধ দল পর্তুগালে ছিলনা, তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে বে-আইনী ঘোষিত ও নির্মমভাবে নির্যাতিত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগ স্থাপন করলেন। এইভাবে তাঁদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটল।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোয় আলোকিত পথে অগ্রসর হতে গিয়ে বুদ্ধিজীবী-গোষ্ঠী উপলব্ধি করলেন যে আফ্রিকার বিশেষ অবস্থা বিচার না করে এ পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন। তাই তাঁরা আফ্রিকার বিশেষ সমস্যাগুলি অনুধাবন ও জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কঠিন কাজে ব্রতী হলেন।

এই কঠিন কাজে যাঁরা সাফল্য অর্জন করলেন তাঁদের মধ্যে আমিলকার কাব্রালের নাম জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেছে।

তরুণ ইঞ্জিনীয়ার কাব্রাল বিসাউ শহরে গিয়ে সরকারি চাকরিতে যোগ দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর উপর কৃষিসমীক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হলো। দুই বছর ধরে তিনি ঘুরলেন দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগ স্থাপিত হল। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে নতুন পথ অনুসরণের যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করল।

অবশ্য গিনি বিসাউ এবং পর্তুগীজ লাটসাহেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তিনি এড়াতে পারেন নি। পর্তুগীজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধ করুন আর না হয় কারাবরণ করুন—লাটসাহেবের এই হুঁসিয়ারিতে কাব্রাল মাথা গরম করলেন না, বিচলিতও হলেন না। নিঃশব্দে লিসবনে ফিরে গিয়ে কাব্রাল ইঞ্জিনীয়াররূপে সরকারি চাকরি গ্রহণ করলেন। আখের ক্ষেতে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে তাঁকে আংগোলার বেনগুয়েলা অঞ্চলে পাঠানো হলো।

আংগোলায় তখন মুক্তি আন্দোলন অনেকটা দানা বেঁধেছে। মুক্তিকামীদের গোপন সভাগুলিতে কাব্রাল যোগ দিতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে পর্তুগালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত আন্দোলনে যোগ দিয়ে নেতো পুলিসের নজরে পড়েছেন এবং একাধিকবার কারারুদ্ধ থেকে শেষপর্যন্ত ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লুয়ান্ডায় ডাক্তার হয়ে বসেছেন। অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা প্যারিসে একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন এই সময়ের মধ্যে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক নতুন দিগন্ত তখন উদ্ভাসিত হতে শুরু করেছে।

পর্তুগীজ সরকার ঝড় আসন্ন বুঝে নির্মম দমননীতি অনুসরণ করে মুক্তি-

আন্দোলনের সামান্ত চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে দিতে চাইলেন। কিন্তু মুক্তি-যোদ্ধাদের প্রচারপত্র বিলির কাজ তখন শুরু হয়ে গেছে। নেতোর কবিতা সাড়া জাগিয়েছে সমস্ত আফ্রিকান বুদ্ধিজীবীদের মনে।

১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে আংগোলার বড়লাট বিমানবহর আনিয়ে পর্তুগীজ সরকারের শক্তির প্রমাণ দিতে চাইলেন। স্পষ্ট ভাষায় জানালেন যে যুদ্ধ নয় শান্তি বজায় রাখার জন্যই বিমান বাহিনীকে তলব করা হয়েছে। আর ভয়ঙ্করতম চেহারায় কমিউনিজমের দ্বারা অনুপ্রাণিত আন্দোলনকারী ও অনিষ্টকারীদের মোকাবিলা করার মতো যথেষ্ট শক্তি যদি রাষ্ট্রগুলি দেখাতে পারে তবেই শান্তিরক্ষা করা সম্ভব। "আমরা প্রচারপত্রের যুগে বাস করছি…আংগোলার প্রচারপত্র দেখা দিয়েছে।"

পর্তুগীজ শাসকচক্র সর্বপ্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বিলম্ব করল না। হাজার হাজার সৈন্য, সমরসম্ভারের সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকায় বসতি করানোর উদ্দেশ্যে দলে দলে পর্তুগীজদের পাঠানো হলো।

ভয়ের কারণ ছিল বৈকি! পর্তুগালে ও তার উপনিবেশগুলিতে ফ্যাসিস্ট সালাজার সরকারের বিরুদ্ধে বহু লোক ভোট দিয়েছে। অ্যাংগোলার পার্শ্ববর্তী বেলজিয়ান কংগোর জনগণের বিক্ষোভ এবং পুলিশের গুলিবর্ষণ সারা ইয়োরোপে আলোড়ন তুলেছে। বেলজিয়াম কংগোর জনগণের দাবি মেনে নিয়ে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছে—এই অবস্থায় অ্যাংগোলার মানুষও চঞ্চল হয়ে উঠবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু ফ্যাসিস্ট সালাজার সরকার আতঙ্কে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ল। ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল, দমননীতি কঠোর থেকে কঠোরতর হলো।

ইতিমধ্যে আমিলকার কাব্রাল ও তাঁর পাঁচ জন সাথী মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব শুরু করে দিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে স্থাপিত হয়েছিল পর্তিদো আফ্রিকানো দি ইনদিপেনদেনসিয়া দি গিনি এ কাবো ভারদে (পি এ আই জি সি) বা গিনি ও কেপ-ভারদের মুক্তিকামী আফ্রিকান পার্টি। এই পার্টি এক নতুন ধরনের পার্টি। অনগ্রসর আফ্রিকায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের জন্যে সংগ্রাম না চালিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম বা রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানো সম্ভব হবেনা এই কঠিন সত্য আমিলকার কাব্রাল ও তাঁর সাথীরা উপলব্ধি করেছিলেন তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে।

আমিলকার কাব্রাল ও তাঁর সাথীরা দেশের মানুষের প্রত্যেকটি সমস্যা অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করে, শ্রেণীবিন্যাস ও প্রতিটি শ্রেণীর মনোভাব বিচার করে

বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব শুরু করেছিলেন। তাঁদের অগ্রসর হতে হয়েছিল পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীদের গড়ে তোলা "নীরবতার প্রাচীর" ভাঙতে ভাঙতে। পৃথিবীর কোনো দেশ জানত না, জানতে পারত না যে, পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকায় কি হচ্ছে। নির্মম সন্ত্রাস পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার মানুষদের মূক করে দিয়েছিল। সালাজারের ফ্যাসিস্ত শাসন কায়েম হওয়ার পর সামান্যতম গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের, ন্যূনতম শাসন-সংস্কারের সম্ভাবনাও লুপ্ত হয়ে গেল। জনগণের সমস্ত বিক্ষোভ বিপ্লবের মধ্যে আত্মপ্রকাশের পথ গ্রহণ করল।

জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিপ্লবী নেতারা প্রত্যেকটি সমস্যা তাদের সামনে তুলে ধরে সমস্যা সমাধানের পথ দেখাতে দেখাতে বিপ্লবী কর্মী সংগ্রহ ও সংগঠন গড়ে তুলতে লাগলেন। এমনিভাবে অক্লান্ত অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁরা জনগণের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হলেন। গণচেতনা জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করল। এরই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল নতুন চিন্তা-ধারা, যে চিন্তাধারা সমগ্র সমাজের পরিবর্তন ঘটানোর ডাক দিল। যা ছিল বা যা আছে তা নয়, যা চিরাচরিত, সনাতন তা নয়, অন্য কিছু, নতুন কিছু চাই নইলে অগ্রসর হওয়া যাবেনা, বিদেশী শাসনের কবল মুক্ত হওয়া যাবেনা, মাথা তুলে দাঁড়ানো যাবেনা—এই চিন্তাধারা প্রথমে ধীরে ধীরে, ক্রমে প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে থাকল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। বলাবাহুল্য এই নতুন চিন্তাধারার মূলে ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। গিনি-বিসাউ-এর মুক্তি সংগ্রামের নেতারা এই চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েই নতুন পথের সন্ধান পেয়েছিলেন।

গিনি-বিসাউ তথা সমগ্র আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের চেহারা বদলে গেল। বিশ্ব-ব্যাপী মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগ স্থাপিত হলো, পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীদের বহু যত্নে গড়ে তোলা "নীরবতার প্রাচীর", সনাতন সমাজব্যবস্থার অচলায়তন বিপ্লবের প্রবল বন্যায় ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

পর্তুগীজ আফ্রিকার জনগণ এবার সরাসরি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সম্মুখীন হলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মুক্তি আন্দোলনের বন্যা ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। আফ্রিকায় একটির পর একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটতে লাগল। বিক্ষোভের ঢেউ উঠল পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকায়। মুক্তি আন্দোলনের এক নতুন পর্যায় শুরু হলো শ্রমিক ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে। ১৯৫৬ সালে গিনিতে নৌ-পরিবহন শ্রমিকরা ধর্মঘট করলেন। ১৯৫৯ সালে বিসাউ বন্দরে ডক শ্রমিকরা আরও বেশি

মজুরীর দাবিতে ধর্মঘট করলে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিস গুলি চালায়, ফলে ৫০ জন নিহত ও বহু আহত হয়। এর ফলে গণবিক্ষোভ এমন বিরাট আকার ধারণ করে যে, পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী সহ বিরাট এক সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করতে হয়। বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন অভ্যুত্থান, ধর্মঘট ও আইন অমান্য আন্দোলন ক্রমে সংগঠিত রূপ নিতে থাকে। পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলের একটি অভিন্ন মোরচা গড়ে ওঠার সূচনা হয় ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে কাসাব্লাংকায় অনুষ্ঠিত আফ্রিকায় পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলগুলির মুক্তি আন্দোলনের প্রতিনিধিদের প্রথম সম্মেলনে। আংগোলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে গিনিও অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

তিন বছরেরও অধিককাল ধরে দৃঢ়সংকল্প ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে নবগঠিত পার্টি সশস্ত্র গেরিলা দলগুলি গঠন করে। ওরই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের ও সাধারণ কর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া, অস্ত্র ও যুদ্ধ পরিচালনা শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি কাজ ও চালানো হয়। মাঝে মাঝে ছোটখাটো সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে গেরিলা দলগুলি পোক্ত হয়ে ওঠে। কাসাব্লাংকা সম্মেলনের পর ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে গিনি অস্ত্রধারণ করে কার্যত পর্তুগীজ উপনিবেশবাসীদের পশ্চাতে দ্বিতীয় ফ্রন্ট বা রণাঙ্গণ সৃষ্টি করে।

গিনি ও কেপ-ভারদের মুক্তিযোদ্ধারা প্রস্তুত হয়েই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ১৯৬০ সালের ১৫ নভেম্বর পার্টির একটি স্মারকলিপিতে গিনি ও কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের জনগণের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব লাভের অধিকার, অবিলম্বে পর্তুগীজ ফৌজ প্রত্যাহারের। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের, পর্তুগালের সমস্ত সামরিক ঘাঁটি ভেঙে ফেলার ও তুলে দেওয়ায় এবং আফ্রিকানদের সমান অধিকার মেনে নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

জবাবে পর্তুগালের ফ্যাসিস্ত সরকার পিটুনি ফৌজ পাঠায়। দেশপ্রেমিকরা পাল্টা জবাব দেন ১৯৬২ সালের গোড়ার দিকে দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে।

ক্ষুদ্র গিনি-বিসাউ-এর স্পর্ধা সালাজার সরকারকে উন্মত্ত করে তুলল। পিটুনি ফৌজ নির্বিকারে গ্রামবাসীদের হত্যা করে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে, ফসল নষ্ট করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার তাণ্ডবে মেতে উঠল। কিন্তু মুক্তিফৌজের বিজয় অভিযান তারা প্রতিহত করতে পারল না। গিনি-বিসাউ-এর অর্ধাংশ মুক্তিফৌজের দখলে এলো।

গিনি-বিসাউ ও কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের মুক্তিফৌজকে প্রকৃতপক্ষে লড়তে

হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের জোটের বিরুদ্ধে। সালাজার স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন "আংগোলা, গিনি অথবা মোজাম্বিক রক্ষা করতে গিয়ে আমরা সমগ্র পশ্চিমী দুনিয়াকে রক্ষা করছি।" গিনি-বিসাউ এর জনগণের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে পর্তুগীজরা মার্কিন নাপাম বোমা, ফরাসি গানবোট এবং পশ্চিম জার্মানির কামান কিছুই ব্যবহার করতে বাকি রাখেনি। ১৯৬৬ গোড়ার দিকে পর্তুগীজ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ হাজার।

দেশপ্রেমিকদের শক্তি ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায় গিনি-বিসাউ-এর বৃহত্তম যুদ্ধে। এই যুদ্ধ হয় ১৯৬৪ সালে কোমো দ্বীপে। দ্বীপটি মুক্তিফৌজ এক বছর দখলে রেখেছিল। মুক্তিফৌজকে এই দ্বীপ থেকে উৎখাত করার জন্যে পর্তুগীজরা প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। দ্বীপের অধিকাংশ গ্রাম, ফসল ও গরুবাছুর ধ্বংস করেও পর্তুগীজ ফৌজ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। বরং তাদের নির্বিচার আক্রমণের জবাবে সাধারণ মানুষ দলে দলে মুক্তিফৌজে যোগ দেয় এবং নিজেদের প্রাণ বিসর্জন করে তাদের সাহায্য করে। পর্তুগীজ বাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হয় এবং বিপুল রণ-সম্ভার মুক্তিফৌজ দখল করে। শেষপর্যন্ত পর্তুগীজ ফৌজকে দ্বীপটি ছেড়ে পালাতে হয়।

১৯৬২ সালেই গেরিলা দল বগফিন দ্বীপ অধিকার করে। এই দ্বীপটি গিনির সমুদ্রোপকূলবর্তী 'ধান্যভাণ্ডার' বলে অভিহিত উর্বর অঞ্চল রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলেই গেরিলা দল এটি আগেভাগেই দখল করে নেয়। এখান থেকে স্থানীয় জনসাধারণের ও তাদের নিজেদের জন্যে নয়, অন্যান্য মুক্ত অঞ্চলের জন্যেও চাল পাঠানো হতো। পর্তুগীজরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও দ্বীপটি পুনরধিকার করতে পারেনি। এখানে ও জনসাধারণ ও মুক্তিফৌজের অসম সাহসিক সংগ্রাম তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।

গেরিলা দলগুলির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী। মুক্তিফৌজ বলতে প্রধানত এই সৈন্যবাহিনীকেই বোঝায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অটুট সহযোগিতায় এই মুক্তিফৌজ গড়ে তুলে দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। শুধু ১৯৬৫-১৯৬৬ সালেই গিনির মুক্তি-ফৌজ ও গেরিলাবাহিনীর আক্রমণে সাড়ে তিন হাজার পর্তুগীজ অফিসার ও সৈন্য প্রাণ হারায়। পথঘাটহীন গভীর অরণ্যাঞ্চলে ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমানের সাহায্যে যুদ্ধ চালানো পর্তুগীজদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। যেকোনো মুহূর্তে গেরিলা বাহিনী ও মুক্তিফৌজের আক্রমণের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত সৈন্যদের নিয়ে সেনাপতিদের বড়ো

রকমের যুদ্ধ চালানোর উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। সৈন্যদের সুরক্ষিত শিবিরগুলিতে মোতায়েন রেখে এবং মুক্তাঞ্চলগুলিতে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করেই তারা ক্ষান্ত থাকেন।

১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে স্বল্পসংখ্যক গেরিলা যে সংগ্রামের সূচনা করেছিল তা দেখতে দেখতে বিরাট আকার ধারণ করে পর্তুগীজ সরকারের বিপর্যয় ঘনিয়ে তোলে।

সশস্ত্র পর্তুগীজ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়া যায় একথা গিনি-বিসাউ ও কেপ-ভারদে দ্বীপাবলীর সাধারণ লোক ভাবতেই পারেনি। তাই, তাদের বিশ্বাস অর্জন ও ভুল ভেঙে দেওয়ার জন্যেই প্রথম আক্রমণ সংগঠিত হয়। মাত্র ১০ জন গেরিলা ৩টি মাত্র অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পর্তুগীজ সৈন্যদের তিনটি যানের উপর। আক্রমণে নিহত হয় ৭ জন সৈন্য, গেরিলারা দখল করে ৮টি আগ্নেয়াস্ত্র। আগুনের ফুলকি থেকে জ্বলে ওঠে দাবানল। ১৯৬৬ সালের মধ্যেই দুর্ধর্ষ মুক্তিফৌজ ও গেরিলা বাহিনী রণাঙ্গনের সর্বত্র প্রাধান্য স্থাপন করে। ১৯৬৮ সালেই গিনিতে পি এ আই জি সি বা গিনি ও কেপ-ভারদের মুক্তিকামী পার্টি যুদ্ধে জয়লাভ করে যদিও পর্তুগীজ সরকার তা স্বীকার করেনি।

প্রকৃতপক্ষে পর্তুগীজ অধিকৃত দ্বীপগুলির মুক্তিযোদ্ধারা মূল ভূখণ্ডে যে মুক্তিযুদ্ধ চলছিল তার দ্বিতীয় ফ্রন্ট বা রণাঙ্গন সৃষ্টি করে পর্তুগীজ বাহিনীর বিপর্যয় ঘটায়। পর্তুগীজ অধিকৃত অফ্রিকায় গিনি-বিসাউ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৭৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মুক্ত এলাকা মাদিনা দোবোয়েতে জাতীয় গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১২০ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন ২৫ সেপ্টেম্বর পরিষদ স্বাধীনতা ঘোষণা করে গিনি-বিসাউ প্রজাতন্ত্রের সংবিধান অনুমোদন করেন এবং সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক ও শাসন সংস্থাগুলি গঠন করেন।

সংবিধানে বলা হয়:

"গিনি-বিসাউ সার্বভৌমিক, গণতান্ত্রিক, উপনিবেশবাদ-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রজাতন্ত্র।"

রাষ্ট্রীয় পরিষদের (মন্ত্রিসভা) সভাপতি নির্বাচিত হলেন লুইজ কাব্রাল।

গিনি-বিসাউ-এর সংবিধান অনুসারে গিনি ও কেপ-ভারদের স্বাধীনতাকামী আফ্রিকান পার্টি (পি এ আই জি সি) দেশের নেতৃস্থানীয় ও সংগঠনকারী দল। রাষ্ট্রের সমস্ত সংস্থা এই দলের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। পার্টির নিজস্ব নিয়মাদি ও কর্মসূচী আছে। ১৯৭৩ সালের জুন মাসে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে আততায়ীর

হাতে নিহত সাধারণ-সম্পাদক আমিলকার কাব্রালের স্থলে সাধারণ-সম্পাদক নিযুক্ত হন সারিস্তিভস পেরেইরা।

যখন গিনি-বিসাউ স্বাধীনতা ঘোষণা করল তখন দেশের তিনভাগের দুইভাগ শত্রু-কবল মুক্ত হয়েছে। গিনি-বিসাউ-এর মুক্তিফৌজের রণকৌশল অসাধারণ বীরত্ব ও সংগঠনশক্তি পর্তুগীজ বাহিনীর মনোবল ভেঙে দিয়েছিল।

পর্তুগালে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটার পর নবগঠিত প্রগতিশীল পর্তুগীজ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী গিনি ও কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতাকামী আফ্রিকান পার্টির সঙ্গে পর্তুগীজ সরকারের যুদ্ধাবসান ও রাজনৈতিক মীমাংসা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। তিন দফায় আলোচনা শেষ হয় আলজিয়ার্স-এ ১৯৭৪ সালের ২৮ অগস্ট। উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরিত যুক্ত ঘোষণায় বলা হয় যে পর্তুগাল ১০ সেপ্টেম্বর আইনগতভাবে গিনি-বিসাউকে সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করবে এবং ১৯৭৪ সালের ৩১ অক্টোবরের আগেই নতুন প্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ড থেকে পর্তুগীজ ফৌজ প্রত্যাহার করবে।

ঘোষণায় গিনি-বিসাউ প্রজাতন্ত্র পর্তুগালের স্বীকৃতিলাভের অব্যবহিত পরেই উভয় দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার বিষয়েও উভয়পক্ষ একমত হয়েছেন বলে জানানো হয়। এ ছাড়া অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্পর্কে পরে চুক্তি সম্পাদিত হবে বলেও জানানো হয়।

কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে উভয়পক্ষ একমত হয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে পর্তুগালের অস্থায়ী সরকার কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের ও স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করে নেন। আলজিয়ার্স-এ উভয়পক্ষ কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের জাতীয় গণ-পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে একটি অস্থায়ী কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন করতে রাজী হন। স্থির হয় এই কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি হবে গিনি-বিসাউ ও কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতাকামী আফ্রিকান পার্টি এবং এক-তৃতীয়াংশ হবে স্থানীয় পর্তুগীজ প্রশাসনের লোকজন। নির্বাচিত জাতীয় গণ-পরিষদ স্থির করবে কিভাবে কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের জনগণ গিনি-বিসাউ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে। কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের ইচ্ছানুযায়ী কেপ-ভারদে এক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। গিনি-বিসাউ ও কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে আরও দুটি ছোট দ্বীপের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস স্মরণ করা উচিত। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই ছোট দ্বীপ দুটির জনগণের

অবদান কম নয়। সাও তোম (সেন্ট টমাস) ও প্রিন্‌চেপে—পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে গিনি সাগরের এই দুটি দ্বীপের আয়তন মাত্র ৯৬৪ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ৮০ হাজারের মতো।

নির্মম অত্যাচার ও সন্ত্রাস উপেক্ষা করে এই দুটি দ্বীপের স্বল্পসংখ্যক মানুষ প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয় ৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে। ছোট ছোট কয়েকটি বিপ্লবী গোষ্ঠী গোপন সংগঠন গড়ে তোলে। ক্রমে এইসব বিপ্লবী গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়।

১৯৫২-৫৩ সালে এক ধরনের অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে দুটি দ্বীপের অধিবাসীরা তাদের প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। তারা সমস্ত সরকারি কাজ এড়িয়ে যেতে থাকে, ফলে রাস্তাঘাট তৈরি, বাগিচাগুলিতে চাষ আবাদের কাজ প্রভৃতি নানাপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বহু লোক পর্তুগীজদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে গভীর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ক্রোধোন্মত্ত পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ গ্রামের পর গ্রাম ছারখার করে দেয় এবং "সন্দেহভাজন" সমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করে। এদিকে কফি, পেপে ও কলা বাগিচাগুলিতে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পর্তুগীজদের রপ্তানি বাণিজ্য কঠিন সংকটের সম্মুখীন হয়। বড় বড় কোম্পানিগুলির বিপুল মুনাফা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় পর্তুগীজ পুলিস ও সৈন্যদল জনগণের মনোবল ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার নির্মম ব্যবস্থা অবলম্বন করে। প্রতিরোধ আন্দোলন যে গ্রামে শুরু হয়েছিল বলে পর্তুগীজরা সন্দেহ করে সেই বা-টো-পা গ্রামে বীভৎস অত্যাচার চালানো হয়।

এর ফলে প্রতিরোধ আন্দোলন আরও তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯৬১ সালে স্থাপিত হয় সাও তোম ও প্রিনচেপে দ্বীপের মুক্তি কমিটি। এই মুক্তি কমিটির মধ্যে সমস্ত বিপ্লবী গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়। মুক্তি কমিটির নেতৃত্বে ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং ১৯৬৩ সালে তুঙ্গে ওঠে। এই সময় মজুরীবৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবিতে শতকরা ৯০ জন শ্রমিক ধর্মঘট করে।

মুক্তি কমিটিই সাও তোম ও প্রিনচেপে দ্বীপের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে কাসাব্লাংকায় অনুষ্ঠিত পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার বিভিন্ন অংশের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিনিধিদের প্রথম সম্মেলনে সশস্ত্র সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সাও তোম ও প্রিনচেপে দ্বীপেও মুক্তি কমিটি জনগণকে অস্ত্র ধারণের জন্যে আহ্বান জানায়। ১৯৭২ সালে মুক্তি কমিটির ভিত্তি ব্যাপকতর করে "সাও তোম ও প্রিনচেপে দ্বীপের মুক্তি আন্দোলন" (এম এল এম টি পি) নামে

নতুন সংগঠন স্থাপন করা হয়। ঐক্যবদ্ধ এই নতুন সংগঠন পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলের মুক্তি যোদ্ধাদের এবং পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগ স্থাপন করে।

সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করেই সাও তোম ও প্রিনচেপে দ্বীপের মুক্তি আন্দোলনের নেতারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এই কর্মসূচীতে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা, মেহনতি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সামাজিক অসাম্যের অবসান ঘটানো, বিনা পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, এবং সামর্থ্য ও প্রশিক্ষণ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে দার-এস-সালামে অনুষ্ঠিত পর্তুগীজ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ ও সুসমন্বিতভাবে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 'সাও তোম ও প্রিনচেপে দ্বীপের মুক্তি আন্দোলন' সংগঠন গিনি ও কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে একযোগে সংগ্রাম চালাতে থাকে। পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট উন্মুক্ত হয় এবং পর্তুগীজ বাহিনীর পরাজয় আসন্ন হয়ে ওঠে।

১২

"মুখ্যত আফ্রিকায় এবং সবচেয়ে বিশেষ করে মোজাম্বিকে পর্তুগালের সমস্যাগুলিই কায়তানো সরকারের পতন ঘটায়।"

—জন পল : বিপ্লবের স্মৃতিকথা

পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে আড়াই হাজার কিলোমিটারেরও বেশী জায়গা জুড়ে মোজাম্বিকের অবস্থিতি। মোজাম্বিকের মোট আয়তন ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৮৩ লক্ষের কিছু বেশী (১৯৭০)।

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ ভাসকো দা গামা ভারত মহাসাগরে পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে একটি ছোট্ট প্রবাল-দ্বীপে নেমে পর্তুগালের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল পরে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক আফ্রিকা ভাগাভাগির সময় রেষারেষির সুযোগ গ্রহণ করে পর্তুগাল পূর্ব আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ভাসকো দা গামা প্রবালদ্বীপের নাম দিয়েছিলেন মোজাম্বিক। এই মোজাম্বিক নামেই পর্তুগীজ অধিকৃত পূর্ব-আফ্রিকা পরিচিত হয়।

ব্রিটেনের সমর্থনেই পর্তুগাল পূর্ব আফ্রিকায় বিশাল ভূখণ্ডের অধিকার লাভ করে এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-পর্তুগীজ চুক্তির বলে তার অধিকার কায়েম হয়।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকে হানা দিয়েও পর্তুগাল সমুদ্রোপকূলের কয়েকটি ছোট অঞ্চল এবং নদী-উপত্যকা ছাড়া বেশী কিছু দখল করতে পারেনি। আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগে পর্তুগীজরা ঢুকতেই পারেনি। পর্তুগাল যখন ইয়োরোপে নগণ্য

শক্তিতে পরিণত হলো তখন অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর ২০-এর দশকে এলো তার সুযোগ। ব্রিটেন, জার্মানি ও ফ্রান্স—এই তিনটি বড় শক্তির বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করল পর্তুগাল। তার অধিকৃত অঞ্চলগুলি সে শুধু রক্ষা করতে পারল তা নয়, কিছুটা সম্প্রসারিত করতে পারল। কিন্তু অনগ্রসর পর্তুগালের পক্ষে পুঁজি লগ্নী করে শিল্প প্রভৃতি গড়ে তোলা সম্ভব ছিলনা, কাজেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মতো বাণিজ্য নিয়েই তাকে খুসী থাকতে হলো। পর্তুগাল তার উপনিবেশগুলিতে রপ্তানি করতো মোটা কাপড় আর নিকৃষ্ট মদ। পর্তুগীজ বাসিন্দাদের ছিল ছোট ছোট বাগিচা; স্থানীয় অধিবাসীদেব এইসব বাগিচায় বেগার খাটতে হতো। পর্তুগাল ব্রিটেনের বহু দিনের মিত্র রাষ্ট্র—৬ শত বছরের বন্ধুত্ব! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সে সময় সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, তার ঐশ্বর্যের অন্ত নেই, তার সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। মিত্র পর্তুগালকে সহজেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যগে আনল, ফলে পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে ব্রিটিশ লগ্নী হুহু করে বাড়তে লাগল। প্রকৃতপক্ষে পর্তুগাল নিজেই আধা ঔপনিবেশিক পরনির্ভর দেশে পবিণত হলো। লেনিন বলেছিলেন যে, পর্তুগাল ব্রিটেনের আশ্রিত, প্রথম মহাযুদ্ধের পব আশ্রিত পর্তুগাল ব্রিটেনের উপব আরও নির্ভরশীল হয়ে উঠল। ১৯২৪ সালে পর্তুগালের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড; এর ৯৫ শতাংশেরও বেশী হলো (৬ কোটি পাউণ্ড) ব্রিটেনের কাছে।

১৯২৯-১৯৩৩ সালে বিশ্বব্যাপী সংকটের ধাক্কায় পর্তুগাল প্রায় দেউলে হয়ে গেল। এই সময় পর্তুগালের অর্থমন্ত্রী সালাজার দেখা দিলেন "দেশের পরিত্রাতা" রূপে। উপনিবেশগুলিকে পুরোমাত্রায় শোষণ কবে দেশকে বাঁচানোর চেষ্টা চলল। রাষ্ট্রের হর্তাকর্তা-বিধাতারূপে সালাজার দেশে ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম কবলেন এবং আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে আফ্রিকান অধিবাসীদের রক্ত নিংড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

প্রথম ব্যবস্থা: নতুন কর ধার্য। ১৬ থেকে ৬০ বছর বয়সের সমস্ত দেশীয় পুরুষকে "জিজিয়া" দিতে হবে যার পরিমাণ হলো একজন আফ্রিকান শ্রমিকের বার্ষিক আয়ের এক-তৃতীয়াংশের বেশী। এরই সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ করগুলিও খুব বাড়িয়ে দেওয়া হলো।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা: আফ্রিকানদের "পর্তুগাল সভ্যতা"র স্রোতে টেনে আনার জন্যে বেগার খাটা আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করা হয়। তিন মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত রাষ্ট্র অথবা ব্যক্তিগত মালিকের অধীনে যে কোনো "অলস" আফ্রিকানকে বেগার

খাটানোর ক্ষমতা দেওয়া হলো উপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে। বেগার দিতে অস্বীকার করলে কঠোর শাস্তির বিধান হলো।

তৃতীয় ব্যবস্থা: প্রতিবেশী দেশগুলিতে আফ্রিকান শ্রমিক রপ্তানি। দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ায় লক্ষাধিক শ্রমিক পাঠানোর ব্যবস্থা হলো। চুক্তি অনুসারে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ প্রতি শ্রমিক পিছু পেলেন ৩৫ শিলিং। এইসব ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্যে দরকার হলো দমন-পীড়নের বিরাট যন্ত্রের যার অপরিহার্য অঙ্গ ফৌজ ও ও পুলিশ। বড় বড় জনপদে ফৌজ মোতায়েন করা হলো। সর্বত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল পুলিশ এবং গুপ্তচরেরা। এদের সঙ্গে যুক্ত হলো পর্তুগীজ বাসিন্দাদের ফ্যাসিস্ট সংঘ। ফ্যাসিস্ট কায়দায় শোষণ ও শাসনের যে নতুন সংগঠন গড়ে তোলা হলো তার ফলে দীর্ঘকালের মধ্যে পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে মানুষের আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলনা, কারা গহ্বরের শান্তি বিরাজ করতে লাগল সমগ্র উপনিবেশে।

উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের "সভ্য ও "অসভ্য" এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হলো। স্বভাবতই পর্তুগীজরা "সভ্য" এবং সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সমস্ত আফ্রিকানই "অসভ্য"। কোন আফ্রিকান "সভ্য" বলে গণ্য হবে? যে পর্তুগীজ ভাষা নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করতে পারবে ও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে, নিয়মিত কর দেবে, "সচ্চরিত্র" হবে এবং যার আয় যথেষ্ট হবে এমন আফ্রিকান "সভ্য" বলে গণ্য হতে পারবে। অবশ্য তাকে পর্তুগীজ ফৌজে যোগ দিতে হবে এবং "পর্তুগীজ ধরনে জীবন" যাপন করতে হবে। সমগ্র মোজাম্বিকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এ রকম "সভ্য" আফ্রিকান ১,৮০০-র বেশী পাওয়া যায়নি। "সভ্য" আফ্রিকানদের সাহায্যে ঔপনিবেশিক প্রশাসন চালানোর সুবিধে হবে বলে পর্তুগীজ সরকারের ধারণা হয়েছিল। কিন্তু মুক্তিকামী আফ্রিকানরা এই ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। "সভ্য' হওয়ার বাসনা তাঁদের নেই, তাঁরা স্বাধীনভাবে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে চান, তাঁদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাঁরাই গড়ে তুলবেন—সগর্বে এই কথা ঘোষণা করলেন মোজাম্বিকের মুক্তিকামী জনগণ।

পর্তুগাল তার উপনিবেশগুলি শোষণে পুরাতন পদ্ধতি পরিহার করতে না পেরে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে লগ্নী করতে দিতে বাধ্য হয়। পুরাতন মিত্র ও আশ্রয়দাতা ব্রিটেনের কয়েকটি বড় বড় কোম্পানির হাতে পর্তুগাল তুলে দেয় মোজাম্বিকের অর্ধেকেরও বেশী অঞ্চল। কোম্পানিয়া দি নিয়াসাকে ইজারা দেওয়া হয় ১ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গকিলোমিটার জায়গা। এ ছাড়া অন্যান্য ব্রিটিশ পুঁজি প্রভাবিত কোম্পানিও ২ লক্ষ ৩ হাজার থেকে দেড় লক্ষ কিলোমিটার জায়গা পায়। এইসব কোম্পানি নিজ

নিজ অঞ্চলে সর্বময় ক্ষমতা ভোগ করে। এমন কি কোম্পানিয়া দি মোজাম্বিকের নিজস্ব মুদ্রা বাজারে ছাড়ারও অধিকার আছে। ব্রিটিশ পুঁজি প্রধানত লগ্নী করা হয়েছে আখ, তুলা, চীনাবাদাম প্রভৃতির বিরাট বিরাট বাগিচায়। এ ছাড়া বাণিজ্য-পোতবহরও এইসব কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করে। বেলজিয়াম ও মোজাম্বিকে তুলা বাগিচায় পুঁজি লগ্নী করে। এইভাবে মোজাম্বিকে আফ্রিকান শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। বন্দর, পরিবহণ ইত্যাদিতেও অনেক আফ্রিকানকে নিয়োগ করতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর নবজাত শ্রমিকশ্রেণীই মোজাম্বিকে নবজীবনের সূচনা করে, কবরের শান্তি ঘুঁচিয়ে দিয়ে তারা সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯২৪ সালে মোজাম্বিকের পরিবহন ও ডক শ্রমিকরা ধর্মঘট করে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বুঝিয়ে দেয় যে, এখন থেকে তাদের এক নতুন ও প্রবল শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্তুগাল "নিরপেক্ষ" থেকে তার ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলে। যুদ্ধমান উভয় পক্ষকে খাদ্যদ্রব্য ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল সরবরাহ করে পর্তুগাল বিপুল বিত্তের মালিক হয়। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে মোজাম্বিক থেকে বিভিন্ন দেশে রপ্তানির পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বেড়ে যায়। পর্তুগালের সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ছয়গুণ বেড়ে যায়। যে পর্তুগাল ছিল ব্রিটেনের খাতক, সেই পর্তুগাল ব্রিটেনের মহাজনে পরিণত হয়। যুদ্ধের সময় পর্তুগাল ব্রিটেনকে ৮ কোটি পাউণ্ড ঋণ দেয়। বৃহৎ শক্তিবর্গের বিরোধের সুযোগ নিয়ে পর্তুগাল নিজের ঘর গুছিয়ে নেয় এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্যে টাকা ঢালতেও সক্ষম হয়।

কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে আফ্রিকায় মুক্তি আন্দোলনের প্রসার, নতুন নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাব এবং বিশ্বশক্তিসাম্যের পরিবর্তন পর্তুগালকে বিচলিত করে তোলে। বিশ্বের জনমতকে ধোঁকা দেওয়ার এবং মিত্রশক্তিগুলির সমর্থন লাভের আশায় পর্তুগাল উপনিবেশগুলিকে "সাগরপারের প্রদেশ" বলে ঘোষণা করে আইনত পর্তুগালের সঙ্গে উপনিবেশগুলি সাঙ্গীকরণ সম্পূর্ণ করে। এই সময় থেকে উপ-নিবেশগুলি অখণ্ড পর্তুগাল রাষ্ট্রের অচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য হয়। এইভাবে সালাজার সরকার দেখাতে চাইলেন যে, পর্তুগাল আর ঔপনিবেশিক শক্তি নয়, কাজেই জাতিসংঘে উপনিবেশ সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করতে সে বাধ্য নয়।

এরই সঙ্গে পর্তুগীজ পুঁজি নিয়োগে উৎসাহদানের জন্যে সালাজার সরকার কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। এর ফলে যুদ্ধাবসানের প্রথম ১৫ বছরের

মধ্যে উপনিবেশসমূহের ১০টি বৃহত্তম পর্তুগীজ কোম্পানির পুঁজি দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেল।

এই সময় উপনিবেশে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদেরও বিকাশ ঘটল। পর্তুগাল ব্রিটেনের সঙ্গে বেইরা কারখানা নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি বাতিল করে দিল এবং মার্কিন পুঁজির সাহায্যে বেইরা বন্দর (মোজাম্বিক) ব্যবহারের অধিকার ফিরে পেল (এই বন্দরটি ব্রিটেনের হাতে ছিল)। বেইরা কোম্পানি পরিচালিত বেইরা উমটালি রেলপথটিও পর্তুগীজ সরকার নিজের হাতে নিলেন। এককথায় পর্তুগাল আধুনিক কায়দায় উপনিবেশ শোষণের পদ্ধতি অনুসরণ করতে শুরু করল। এর কিছুটা ফলও হলো। ৬০-এর দশকের গোড়া থেকে পর্তুগালের বাজেটে মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশই আসতে লাগল উপনিবেশগুলি থেকে।

এই সময় মোজাম্বিকের তুলা চাষের প্রসার ঘটল। তুলা সবটাই রপ্তানি হতে থাকল পর্তুগালে। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত তুলার ০.৫ শতাংশ হলো মোজাম্বিকের। এ ছাড়া পৃথিবীর মোট উৎপাদিত সিসল ও নারকেলের শাঁসের যথাক্রমে প্রায় ১০ শতাংশ এবং ২ থেকে ৩ শতাংশ হলো মোজাম্বিকের। কয়লা, সোনা, বকসাইট ও অন্যান্য ধাতু এবং খনিজ পদার্থও অল্প পরিমাণে মোজাম্বিকে আহরিত হতে থাকল। তুলা, আখ ও সিসল ব্যবহারোপযোগী করে তোলার অনেক কারখানা মোজাম্বিকে প্রতিষ্ঠিত হলো।

মার্কিন ও পশ্চিম জার্মান পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটে পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। ১৯৫৫ সালে ২ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার মার্কিন পুঁজি লগ্নী করা হয়। ১৯৫৩ সালে লোরেংকো মারকুয়েস থেকে দক্ষিণ রোডেশিয়া পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্তুগালকে ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার ঋণ দেয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পর্তুগীজ, ব্রিটিশ, মার্কিন পুঁজিপতিরা মুনাফা লুটতে লাগলেন মহানন্দে, আর এই বিপুল মুনাফার মূলে রইল সেই মধ্যযুগের শোষণ ব্যবস্থা —বেগার প্রথা। মোজাম্বিকে প্রতিবছর বাধ্যতামূলকভাবে বেগার খাটার জন্যে চার লক্ষ লোক সংগ্রহ করা হয়। দক্ষিণ মোজাম্বিকে কর্মক্ষম পুরুষদের মাত্র ৫ শতাংশ গ্রামে থাকতে পারে, বাকী সকলকেই কাজের জন্য থেকে যেতে হয় শহরগুলিতে, আর না হয় দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ায়। পর্তুগীজ বাসিন্দাদের অনেকেই বড় বড় খামারের মালিক। সরকার এদের জন্যে ক্ষেতমজুর যোগাড় করে দেয়, বীজ সরবরাহ করে এবং বাজারে কৃষিজাত পণ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করে।. এদিকে আফ্রিকার চাষীরা অর্ধাশনে অনশনে ধুঁকে মরে। জিজিয়া কর বছরে বছরে বেড়ে চলে,

এদিকে আয় নেই বললেই চলে। পর্তুগীজ ও আফ্রিকানদের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে আসমান জমিন ফারাক। মোজাম্বিকে ১৯৫৪-১৯৫৫ সালে আফ্রিকানদের যেখানে বছরে মাথাপিছু এককিলো মাংস ও এক লিটারেরও কম দুধ জুটেছে সেখানে পর্তুগীজরা পেয়েছে মাথাপিছু ৫৮ কিলোগ্রাম মাংস ও ৬৩ লিটার দুধ। প্রতিবছর পুষ্টিহীনতা, অসহনীয় পরিশ্রম ও রোগব্যাধিতে হাজার হাজার আফ্রিকান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত

আফ্রিকানরা যাতে কোনো প্রতিবাদ না জানাতে পারে, সংঘবদ্ধ হতে না পারে তার জন্যে পর্তুগীজ সরকার আফ্রিকান শ্রমিকদের সংস্থা গঠন নিষিদ্ধ করে আইন জারি করেন। কোনরূপ জাতীয় চেতনা যাতে না জাগে তার জন্যে বিভিন্ন উপজাতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা হয়, উপজাতি বিরোধে উস্কানি দেওয়া এবং বিভিন্ন উপভাষা যাতে একটি ভাষায় পরিণত না হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু এত করেও ইতিহাসের গতিকে রোধ করা সম্ভব হয়নি। আহরণ শিল্প ও বাগিচাসমূহের প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় আফ্রিকানরা বৃহদাকার উৎপাদন ব্যবস্থার সামিল হতে থাকে এবং একসঙ্গে কাজ করে ও বাস করে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শহরের জীবন তাদের মনে নতুন চেতনা জাগায়। ৫০-এর দশকের মোজাম্বিকে সাধারণ মানুষের মনে বিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দেয় পর্তুগীজ শাসকরাই। ৫০-এর দশকের শেষ দিকে সমবায় আন্দোলন এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। আফ্রিকান চাষীরা রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদন করে নিজেরাই তা বাজারজাত করার ব্যবস্থা করে। যেসব পর্তুগীজ কোম্পানি এই সব কৃষিপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেছিল তারা এর ফলে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। আফ্রিকান চাষীরা তাদের হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে. তাদের সরকার বজায় থাকতে এ তো হতেই পারেনা। তাই কালা আদমীদের শিক্ষা দেওয়ার দাবি জানালো তারা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সে দাবি সমর্থন করলেন। কালা আদমীরা আবার এই সময় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাতে থাকায় পর্তুগীজ শাসকরা আরও বিচলিত হয়ে ওঠেন। বেশ সুপরিকল্পিতভাবেই আফ্রিকানদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

মুক্তি আন্দোলনের কোন কোন নেতা এই সময় কাবো দেলগাদো জেলায় সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলন। তারা পর্তুগীজদের ক্ষেতখামারে নিযুক্ত আফ্রিকানদের মজুরী বৃদ্ধির এবং সাধারণ মানুষের আরও স্বাধীনতা ও অধিকার দাবি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ গ্রামে গ্রামে পুলিস পাঠিয়ে গ্রামবাসীদের জেলার সদর

দপ্তর মুবেদার সমবেত হওয়ার জন্ম ডেকে পাঠালেন।

পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ কি বলতে চান শোনার জন্যে বেশ কয়েক হাজার গ্রামবাসী সমবেত হলেন মুয়েদায়। কর্তৃপক্ষ যে ফৌজ এনেছেন একথা তারা জানতেই পারেনি।

স্বয়ং পর্তুগীজ লাটসাহেব সমাবেশে উপস্থিত। তিনি নেতাদের ডেকে এনে অনেকক্ষণ তাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জনসাধারণের মধ্যে যারা কিছু বলতে চায় তাদের একসঙ্গে দাঁড়াতে বললেন। সরল বিশ্বাসে অনেক লোক কিছু বলার আগ্রহে একপাশে সমবেত হন।

তৎক্ষণাৎ লাট সাহেবের হুকুমে পুলিস তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারপিট শুরু করে দিল। সমবেত জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানালো জবাবে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের ট্রাকে তুলে নেওয়ার জন্যে পুলিসকে হুকুম দেওয়া হলো। ফলে বিক্ষোভ আরও বাড়ল। এবার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সৈন্যরা বেরিয়ে এসে সোজা সমবেত হাজার হাজার মানুষের উপর গুলি চালাতে শুরু করল। ৬০০ লোক নিহত হলো। মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম নেতা আলবার্তো জোয়াকিন শিপানকে স্বচক্ষে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। তিনিই এই বিবরণ দিয়েছেন। ঘটনার সময় তিনি ছিলেন ২২ বছরের তরুণ। কোনোক্রমে তিনি পালিয়ে বেঁচে যান। চার বছর পরে গেরিলা বাহিনীর অন্যতম প্রথম দলগুলির একটির নেতৃত্ব গ্রহণ করে এই শিপানকেই ফিরে মুয়েদা অঞ্চলে।

মুক্তি সংগ্রামের নেতা এডুয়ার্ডো মণ্ডলেন কয়েক বছর পরে মন্তব্য করেছিলেন যে ঐ হত্যাকাণ্ডের পর অবস্থা আর কখনও স্বাভাবিক হয়নি। এই হত্যাকাণ্ড সমগ্র অঞ্চলে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তীব্রতম ঘৃণা জাগিয়ে তোলে এবং চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে সর্বপ্রকার শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ বৃথা। গোড়ার দিকে উপজাতি জীবনে বিচ্যুত (ডিট্রাইবালাইজ্‌ড্‌) শহরবাসী আফ্রিকান ছিল আফ্রিকান অধিবাসীদের মাত্র ৫ শতাংশ, সেখানে ৬০-এর দশকের দশকের গোড়ার দিকে ১০ শতাংশ আফ্রিকান শহরবাসী হয়। প্রতিবছর মোজাম্বিক ও অ্যাংগোলা থেকে লক্ষ লক্ষ আফ্রিকান দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া ও কংগোয় কাজ করতে যায়। তারা এইসব জায়গায় সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সঙ্গে সংগ্রামের অ-আ-ক-খ শিখেছে।

প্রথম দিকে বিদেশীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং যা কিছু বিদেশী তাই বর্জনীয় এইরূপ মনোভাব নিয়ে এখানে ওখানে ধর্মীয় ও উপজাতিগত ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল গুপ্ত সমিতিসমূহ। এইসব সমিতির কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল গ্রামাঞ্চলে। স্বল্প সংখ্যক বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের রাজনৈতিক সংগঠনগুলি স্থাপন করেছিলেন বিদেশে—

মোজাম্বিকের বাইরে। এইসব বুদ্ধিজীবীর রাজনৈতিক চেতনা তেমন পরিচ্ছন্ন ছিলনা এবং তাঁদের কোনো পরিষ্কার কর্মসূচীও ছিলনা। ৫০-এর দশকের মাঝামাঝি মুক্তিকামী বুদ্ধিজীবীদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনগুলির আবির্ভাব ঘটে।

৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে মোজাম্বিকে বড়ো আকারে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। মোজাম্বিক আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন এবং মোজাম্বিক ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন এই দুটি দল ১৯৬২ সালের গ্রীষ্মকালে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোজাম্বিক মুক্তিফ্রন্ট (নামের আদ্যক্ষর নিয়ে এই সংস্থা সংক্ষেপে ফ্রেলিমো নামে পরিচিত) নামে পরিচিত হয়। মুক্তিফ্রন্টের সভাপতি নির্বাচিত হন এডুয়ার্ডো মণ্ডলেন। ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি মুক্তিফ্রন্টের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলে মুক্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মণ্ডলেনের নেতৃত্বে নতুন এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন— এই দলের নাম মোজাম্বিক মুক্তিফ্রন্টই (ফ্রেলিমো) থাকে।

১৯৬২ সালের ২৫ জুন এডুয়ার্ডো মণ্ডলেন মোজাম্বিক মুক্তিফ্রন্ট (ফ্রেলিমোও)— গঠনের কথা ঘোষণা করেন। দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক সংগঠন এই ফ্রন্টের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই ফ্রন্ট বা মোরচা নতুন মোজাম্বিকের সূচনা করে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুক্তিবাদী একদল নিবেদিত প্রাণ মানুষের নেতৃত্বে মুক্তিসংগ্রাম বাস্তব রূপ নেয়। দুই বৎসরব্যাপী আলাপ-আলোচনা, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা ও সামরিক সংগঠন গড়ার কাজ শেষ করার পর মাত্র ২৫০ জন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মোজাম্বিকের মুক্তিফ্রন্টের নেতারা উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। ১৯৬৬ সালে মুক্তি আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির যে চেষ্টা করা হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯৬১ সাল পর্তুগালের ফ্যাসিস্ত সরকারের পক্ষে এক অশুভ বছর। ব্রাজিলের উপকূলে হেনরিক গালভাত পর্তুগীজ বিলাস-পোত সাল্‌না মারিয়া ছিনতাই করে সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করল এবং ভারতে পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া, দমন ও দিউ মুক্ত করার জন্যে সামরিক অভিযান শুরু করল। এই দুই ঘটনার ফলে ফ্যাসিস্ত পর্তুগালের দিকে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো, বহুদিনের চেপে রাখা অনেক খবর ফাঁস হয়ে গেল। পর্তুগালকে বিশ্বজনমতের আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো।

কিন্তু পর্তুগালের ফ্যাসিস্ত সরকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে বেপরোয়া হয়ে উঠল। পর্তুগালের কোনো উপনিবেশ নেই, আফ্রিকায় যা আছে তা পর্তুগালেরই অচ্ছেদ্য এবং যথাযোগ্য যোগ্যতা অর্জন করলে যে কোনো আফ্রিকান পর্তুগীজ নাগরিকের সব অধিকার পেতে পারে—অহরহ এই প্রচার চলতে থাকল।

আর এই প্রচার চালাতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীরা। তবু বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করা গেলনা। পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীদের বহু যত্নে গড়ে তোলা "নীরবতার প্রাচীর" তখন ভেঙে পড়েছে। মুক্তিকামী আফ্রিকান জনগণের বিরুদ্ধে তাদের পৈশাচিক বর্বরতার সমস্ত খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

মোজাম্বিকে পর্তুগীজদের "বাঁধন যতই শক্ত" হতে থাকল আফ্রিকানদের "বাঁধন ততই টুটতে" লাগল। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যারা দেশপ্রেম, স্বাধীনতা, রাজনীতি এসব কিছুই বুঝত না, পর্তুগীজদের অকথ্য অত্যাচার ও নির্মম শোষণ তাদের স্বাধীনতা লাভের জন্যে পাগল করে তুলল।

এই প্রসঙ্গে দুয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। জন পল একজন ইংরেজ পাদ্রী। ইনি এ্যাংলিক্যান গীর্জার কর্মীরূপে মোজাম্বিকের মেসুমবা মিশনে দীর্ঘ ১৩ বছর কাজ করেন। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন এই মানুষটি পর্তুগীজ শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দরদী বন্ধু হয়ে ওঠেন। কেমন করে সাধারণ খেটে-খাওয়া অজ্ঞ মানুষ সচেতন মুক্তিযোদ্ধায় রূপান্তরিত হয়েছিল তার কাহিনী জানা যায় তাঁর "মোজাম্বিক : বিপ্লবের স্মৃতি" গ্রন্থ থেকে।

কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ :

মেসুমবা থেকে কিছুদূরে নগু বলে একটি জায়গায় এ্যাংলিক্যান পাদ্রীরা একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধারা এখানে এক ব্যক্তিকে পর্তুগীজদের চর সন্দেহ করে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে। এর পরেই সেখানে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়! তবু বিদ্যালয়ের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে মেসুমবা থেকে কার্লেস কাতাতুলা নামক একজন তরুণ শিক্ষককে নগুতে পাঠানো হয়।

একদিন সন্ধ্যাকালে একদল পর্তুগীজ সৈন্য নগুতে হাজির হয়। পাদ্রী চিজুম্বুর তাদের গীর্জায় রাত কাটানোর অনুমতি দেন। সকালে তারা বেরিয়ে পড়ে এবং মাইল দশেক দূরে মুক্তিফৌজের আক্রমণের সম্মুখীন হয়।

ক্রোধে উন্মত্ত পর্তুগীজ সৈন্যরা নগুতে বাড়ি বাড়ি চড়াও হয়ে মিশনের কর্মীদের গ্রেপ্তার ও মারপিট করে। শিক্ষক কাতাতুলার বাড়ি গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই তিনি দরজা খুলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুলি করে মারা হয়। তারপর মিশনের বন্দী কর্মীদের সামনেই তাঁর শিরচ্ছেদ করে মুণ্ড নিয়ে ফুটবল খেলা হয়।

এইরকম সব বীভৎস অত্যাচারের ফলে মেসুমবার উত্তর দিকের প্রায় সমস্ত লোক ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি তানজানিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

পর্তুগীজ সৈন্যদের অত্যাচারের ফলে গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান হয়ে যায়, গ্রামবাসীরা অরণ্যে, পর্বতে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করে, অনেকে দেশ ছেড়ে তানজানিয়া ও মালাউইতে চলে যায়। পর্তুগীজরা নারী শিশু, যুবকবৃন্দ নির্বিশেষে নির্বিচারে সাধারণ গ্রামবাসীদের হত্যা করে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের জবাব দেয়। এর অনিবার্য পরিণতি ঘটে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তিবৃদ্ধিতে। নিপীড়িত গ্রামবাসীরা দলে দলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে থাকে।

১৯৬৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর চারশত বছর পর্তুগালের পদানত মোজাম্বিকে মুক্তিযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। ঐ দিন মুক্তিফ্রণ্টের দুঃসাহসী গেরিলাবাহিনী কাবো দেলগাদো প্রদেশে পর্তুগীজদের এক ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। পরে এই দিনটিকে মোজাম্বিকের বিপ্লব দিবস বলে ঘোষণা করা হয়। অন্যান্য দেশে এই দিনটি মোজাম্বিকের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবসরূপে পালিত হয়।

মোজাম্বিকের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীরা জনসাধারণের উপর নৃশংস অত্যাচার শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ আছে সন্দেহে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করা হয় এবং গ্রামবাসীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। উইরিইয়ামুর ঘটনা এমনই সব ঘটনার অন্যতম। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীদের অমানুষিক অত্যাচার মোজাম্বিকের জনগণের মনোবল ভাঙতে তো পারেই নি, বরং তাদের প্রতিরোধকে ইস্পাত-দৃঢ় করে তুলেছে। দুই বা তিনশত গেরিলা যোদ্ধা নিয়ে যে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল সেই মুক্তিবাহিনী দশ হাজার সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার বিরাট বাহিনীতে পরিণত হয়। মোজাম্বিকের মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসে আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। তানজানিয়ার রাজধানী দার-এস-সালাম মোজাম্বিক ও আংগোলার মুক্তিযুদ্ধে রত রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

দশহাজার মুক্তিসেনা লড়তে থাকে আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত ৩৫ হাজার পর্তুগীজ সৈন্যের বিরুদ্ধে। পর্তুগীজ ফৌজের জন্যে ট্যাংক, কামান, বিমান, যুদ্ধজাহাজ প্রভৃতি সরবরাহ করেছে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জার্মানি। এ সত্ত্বেও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহায়তায় মোজাম্বিকের মুক্তিবাহিনী তাদের দুর্ধর্ষ অভিযান চালিয়ে ৯টি প্রদেশের মধ্যে ৩টি প্রদেশের বেশীরভাগ অঞ্চলকে মুক্ত করে। এই তিনটি প্রদেশ হলো কাবো দেলগাদো, নিয়াসা ও তেতে। আর একটি প্রদেশে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। সুরক্ষিত শহর ও দুর্গাদির

ঘারা রক্ষিত ঘাঁটিগুলি ছাড়া আর সবই পর্তুগীজদের হাতছাড়া হয়। মুক্তিবাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় মোজাম্বিকের এক-পঞ্চমাংশে যার লোকসংখ্যা দশ লক্ষ। যুদ্ধের অবস্থার মধ্যেও মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নতুন সরকার অর্থনীতির পুনর্গঠন, শিক্ষাবিস্তার ও চিকিৎসা ইত্যাদির জন্যে বহু ব্যবস্থা অবলম্বন করে। মুক্তাঞ্চল-গুলিতে শুরু হয় এক নতুন জীবন।

মোজাম্বিকের মুক্তিযোদ্ধাদের পর্বতপ্রমাণ বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। মরিয়া উপনিবেশবাদীরা সামরিক আক্রমণ ও বীভৎস অসামরিক জনগণের উপর অত্যাচার চালানোর সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ শঠতা ও নাশকতার আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৯৬৬ সালে মুক্তিফ্রন্টের সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও নির্ভীক দেশপ্রেমিক স্যামুয়েল মাগাইয়ার মৃত্যু ঘটে এক রহস্যজনক অবস্থায়। ১৯৬৯ সালে মুক্তিফ্রন্টের সভাপতি ও জনগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ডঃ এডুয়ার্ডো মণ্ডলেন ফ্যাসিস্ত পর্তুগীজ সরকারের ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। মোজাম্বিক বিপ্লবী পরিষদ নামে এক ভুয়া-বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন প্রগতিশীল ও বিপ্লবী দল-গুলির কাজে দারুণ বাধার সৃষ্টি করতে থাকে।

এইসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও মোজাম্বিকের মুক্তি সংগ্রাম ক্রমেই আরও প্রবল ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। মুক্তিবাহিনীর রকেট ও গোলাবর্ষণে ধ্বংস হয় চিংগোজি বিমানঘাঁটিতে পর্তুগীজ বিমান, হ্যাঙার প্রভৃতি; রকেট এসে পড়ে কারোরো বাসা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণস্থলের পাশে, মর্টার বর্ষণে বিধ্বস্ত হয় তেতে প্রদেশের রাজধানী।

আতঙ্কে দিশাহারা পর্তুগালের ফ্যাসিস্ত নায়ক ও প্রধানমন্ত্রী মারসেল্লো ছুটে গিয়েছিলেন পুরাতন মিত্র ও মুরুব্বী ব্রিটেনের কাছে। রাজকীয় সম্বর্ধনা পেলেন এই ফ্যাসিস্ত নায়ক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে। পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির মুক্তি আন্দোলন দমনে কায়েতানো যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে "পেয়ার" করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পর্তুগাল অনেকটা স্বয়ম্ভর হয়ে উপনিবেশ শোষণে তৎপর হয়ে উঠলেও মুক্তি আন্দোলনের প্রসার তাকে অথৈ জলে ফেলে দেয়। সাম্রাজ্যবাদী মুরুব্বীদের সাহায্য ছাড়া তার তখন চলবার উপায় নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তো সাহায্য দেওয়ার জন্যে তৈরি হয়েই ছিলেন। মোজাম্বিকের চিনিশিল্পের ৭০ শতাংশ ব্রিটেনের, কারোরো বাসা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে দক্ষিণ আফ্রিকার যেসব কোম্পানি টাকা ঢালছে সেসব কোম্পানিতে ব্রিটেনের বিপুল পরিমাণ টাকা খাটে, মোজাম্বিকে ব্রিটেন বিস্ফোরকের

কারখানা তৈরি করেছে। অ্যাংগোলাতেও ব্রিটেনের বিপুল পরিমাণ টাকা খাটছে। কায়েতানো ঠিক জায়গায় গিয়েছিলেন, তবে সেখানেও মানুষ চোখ বুঁজে নেই। তাই, ব্রিটেনে শুরু হয় পর্তুগালের সঙ্গে মৈত্রীর অবসান ঘটানোর দাবিতে আন্দোলন।

ভিয়েতনাম যে আশার আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে সে আলো নিভিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো শক্তির ছিলনা। তাই মোজাম্বিক মুক্তিফ্রণ্টের (ফ্রেলিমো) সহ সভাপতি মারসেলিনো দোস মানতোজ সেদিন বলেছিলেন :

"ভিয়েতনামের জনগণের অর্জিত জয় রাত্রির দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার মতো। আমরা এখনও বিশ্বাসই করতে পারছি না যে, সেখানে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এ আমাদের সকলেরই এক বিরাট জয়। অবশ্য, সতর্কতাকে শিথিল করা চলবে না। দেশ পুনর্গঠনের জন্যে চেষ্টা করার দরকার হবে। তবু, আমরা বিশ্বের বর্তমান ঘটনাবলীকে নতুন আলোয় দেখতে পাচ্ছি···।"

লুসাকা চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মোজাম্বিকে যুদ্ধের অবসান ঘটল। কিন্তু উগ্র দক্ষিণপন্থীরা তখনও হাল ছাড়েনি। তখনও তারা সাম্রাজ্য-বাদীদের সহায়তায় ক্ষমতালাভের স্বপ্ন দেখছে, রোডেশিয়ার মতো শ্বেতাঙ্গ-শাসিত "স্বাধীন মোজাম্বিকে"-র আকাশ-কুসুম তাদের প্রলুব্ধ করছে। তাই ৭ সেপ্টেম্বর মোজাম্বিকের রাজধানী লুরেনকা মারকুয়েস বোমা বিস্ফোরণের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল। "মৃত্যু-ড্রাগন" গোষ্ঠীর সশস্ত্র লোকেরা ফ্যাসিস্ত মনোভাবাপন্ন লোকেদের সহায়তায় বেতার কেন্দ্র দখল করে নারী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জোর করে সামনে দাঁড় করিয়ে তাদের পিছনে সমবেত হলো। এই "মৃত্যু-ড্রাগন"-দের সঙ্গে যোগ দিল পর্তুগীজদের দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলি। খবরের কাগজের অফিসগুলিতে হানা দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বোমা ফাটিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টায় মেতে উঠল ফ্যাসিস্ত দুর্বৃত্তরা। পর্তুগীজ বাহিনী ও মুক্তিফ্রণ্ট বাহিনী একযোগে নেমে পড়ল দুর্বৃত্তদের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে। সম্মিলিত দুই বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে মৃত্যু-ড্রাগনরা" চুপসে গেল, রক্তাক্ত সংঘর্ষ বাধানোর সব পরিকল্পনা তাদের ফেঁসে গেল এবং স্বল্পকালের মধ্যেই বিদ্রোহের অবসান ঘটল। এই ঘটনা প্রসঙ্গে মুক্তিফ্রণ্টের অন্যতম নেতা সামোরা মাশেল বলেছিলেন :

"যাই হোক, ওরা কখনই মোজাম্বিক বিপ্লবের সাফল্যগুলি নষ্ট করতে পারবে না। আজও না, ভবিষ্যতেও না। আমরা নতুন যুদ্ধ শুরু করতে চাইনা। আমরা দীর্ঘ

দশ বৎসর ধরে লড়ছি, কিন্তু যুদ্ধে যদি বিরোধী শক্তিগুলি মোজাম্বিকের স্বাধীনতা বিপন্ন করে তা হলে যুদ্ধে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে মৃত্যুবরণ করতে আমরা প্রস্তুত।"

লুসাকা চুক্তি অনুযায়ী গঠিত অস্থায়ী মোজাম্বিক সরকার ১৯৭৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে রাজধানী লুরেনকা মারকুয়েস-এ পর্তুগীজ সরকারের প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে স্বাধীন জনগনের কলরব মুখরিত এই অনুষ্ঠানে স্বাধীন মোজাম্বিকের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করলেন।

মোজাম্বিক মুক্তিফ্রণ্টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জোয়াকিন চিসানো (মুক্তিবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব এঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল) প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হলেন। মুক্তি ফ্রণ্টের আরও ৬ জন প্রতিনিধি মন্ত্রিসভার সদস্য হন।

অস্থায়ী সরকারের শাসনভার গ্রহণ উপলক্ষে মুক্তিফ্রণ্টের সভাপতি সামোরা মাশেল তাঁর বাণীতে বলেন যে, মোজাম্বিক আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক বৈপ্লবিক ঘাঁটি।

অস্থায়ী সরকারের উপর ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন পর্যন্ত শাসন পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। মোজাম্বিকের স্বাধীনতা সরকারিভাবে ঘোষিত হয় ২৫ জুন।

১৩

"সর্বোপরি যা দরকার তা হলো উপনিবেশীকৃত জনগণের মনোবৃত্তিকে নতুন করে গড়ে তোলা যাতে তাদের দেশ যখন মুক্ত হয়নি তখনও তারা স্বাধীনভাবে ভাবতে পারে এবং নিজেদের স্বাধীন বলে অনুভব করতে পারে।"

—অগস্তিনো নেতো

অ্যাংগোলা এক বিশাল দেশ—ব্রিটেনের চাইতে পাঁচগুণেরও বেশী বড়, সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ছয়ভাগের একভাগ। এতবড় দেশ, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও অ্যাংগোলা ছিল পৃথিবীর মানুষের কাছে এক অজ্ঞাত রহস্যময় দেশ।

পর্তুগীজরা যখন আফ্রিকায় হানা দিয়েছিল তখন অ্যাংগোলার উপর তারা বিশেষ নজর দেয়নি। তখন পর্তুগীজদের লুণ্ঠন ও রাজ্য বিস্তারের পালা চলেছে পুরোদমে ভারতবর্ষ, সিংহল, মালয় এবং পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে। আফ্রিকায় তখন দাস শিকার ও চালান দেওয়াই ছিল পর্তুগীজদের সবচেয়ে লাভজনক কারবার।

ওলন্দাজদের সঙ্গে বিরোধ বাধার পর অ্যাংগোলার দিকে পর্তুগীজদের নজর পড়ে। এই সময় কঙ্গোর রাজার সঙ্গেও পর্তুগীজদের বিরোধ চরমে ওঠে এবং ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজরা কঙ্গো রাজ্য আক্রমণ করলে কঙ্গোরাজ আনতোনিও পরাজিত হন। তাঁর শিরচ্ছেদ করে পর্তুগীজরা রাজমুকুট ও কাটা মাথা তাদের ঘাঁটি লোয়ানডায় পাঠিয়ে দেয়। এরপর শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের পর পর্তুগীজরা যে বিশাল ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করে তা পর্তুগীজ অ্যাংগোলা নামে পরিচিত হয়। ১৮৫০ থেকে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পর্তুগীজ অধিকৃত অ্যাংগোলার সঙ্গে সভ্য জগতের

কোনো পরিচয় ঘটেনি, কিন্তু পর্তুগীজদের এই সময়ের মধ্যে আফ্রিকানরা চিনে ফেলেছে হাড়ে হাড়ে।

এই শতাধিক বছর হলো 'নীরবতার বছর'। অ্যাঙ্গোলার মানুষের আর্তনাদ, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ বাইরের জগতের কাছে অজানাই থেকে গেছে।

৬০-এর দশকে মুক্তিযুদ্ধের আগুন জলে ওঠার পর অ্যাঙ্গোলা পৃথিবীর মানুষের কাছে 'সংবাদ' হয়ে উঠল।

আফ্রিকায় পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত অ্যাংগোলার আয়তন ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৫২ বর্গমাইল। স্বাধীনতা লাভের সময় আংগোলার লোকসংখ্যা ছিল ৫১ লক্ষ। এর মধ্যে আফ্রিকান ৭৭ লক্ষ ৫৫ হাজার এবং ইয়োরোপীয় (প্রধানত পর্তুগীজ) ৩ লক্ষ ৫০ হাজার।

লড়াই চলেছে ভারত মহাসাগর থেকে অতলান্তিক মহাসাগর পর্যন্ত তিন হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গন জুড়ে আফ্রিকায়। এই রণাঙ্গনের খবর সংবাদপত্রে বড়ো বড়ো শিরোনামা দিয়ে প্রকাশ করা হয়নি, কারণ খবর যাঁরা প্রধানত সরবরাহ করেন তাঁদের অনেকেরই মালিকদের কাছে খবরগুলো সুখবর নয়। তা ছাড়া রণাঙ্গন বলতে আমরা যা বুঝি ঠিক সেই ধরনের রণাঙ্গন এটা নয়। একজন সোভিয়েত সাংবাদিক বলেছেন:

"এ এক অদ্ভুত রণাঙ্গন। এখানে কোনো পরিখা নেই, যুদ্ধমান পক্ষগুলির মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট অবস্থান নেই। আছে শুধু অরণ্য ও ঘাসবনের মধ্যে সুরক্ষিত অঞ্চল ও ঘাঁটি এবং উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মানুষদের ক্রমবর্ধমান বাহিনী, যারা জানে যে তারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে।"

মোজাম্বিক থেকে অ্যাংগোলা পর্যন্ত বিস্তৃত এই রণাঙ্গনে চলে পর্তুগীজ উপনিবেশ-বাদের বিরুদ্ধে বর্ণদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ শাসকচক্রের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী আফ্রিকানদের মরণপণ সংগ্রাম। এই সংগ্রাম শুধু আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা, এই সংগ্রাম ছড়িয়ে গিয়েছিল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে বিসাউ (পর্তুগীজ অধিকৃত গিনি) কেপ ভারদে, সেন্ট টমাস (সাও তোম) ও প্রিন্‌চিপে দ্বীপপুঞ্জে।

আফ্রিকার বিশাল ভূখণ্ড অধিকার করলেও পর্তুগালের মতো একটি অনুন্নত দেশের পক্ষে তা কাজে লাগানো সম্ভব ছিলনা। এর সুযোগ গ্রহণ করে 'আশ্রিত' পর্তু-গালের অভিভাবকরূপে এগিয়ে এলো ব্রিটেন।

অ্যাংগোলার বৈদেশিক বাণিজ্য ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির কুক্ষিগত হলো। চিনি, সিসল ও রপ্তানিযোগ্য অন্যান্য পণ্য উৎপাদনে ব্রিটিশ পুঁজির পরিমাণ বাড়তে লাগল। ১৯১৭ সালে মার্কিন ও বেলজিয়ান পুঁজিপতিদের সঙ্গে মিলে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা স্থাপন করলেন কোমপানিয়া দি দায়ামেনতেস দি অ্যাংগোলা। এই কোম্পানি সমগ্র অ্যাংগোলায় হীরক খনিসমূহের সন্ধান ও হীরক আহরণের অধিকার লাভ করল।

অ্যাংগোলার প্রধান বন্দর লোবিটোর সঙ্গে কাটাঙ্গা হীরক খনির সংযোগ সাধনকারী বেনগুয়েলা রেলপথ নির্মাণে ১৯০২ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ব্রিটেন পুঁজি ঢাললো। অ্যাংগোলার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রধান রেলপথের মালিক কোমপানিয়া দেস কামিনোস দি ফেররো দে বেংগেলেব ৯০ শতাংশ শেয়ারই ব্রিটিশ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে থাকল। বেলজিয়াম পুঁজিও বেশ জাঁকিয়ে বসল। অ্যাংগোলার পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠল কংগোর হীরক খনি অঞ্চলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে।

সালাজারের আমল থেকে শুরু হলো পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিকে তীব্রতর শোষণের ব্যবস্থা। এই সময় জার্মান পুঁজিকে স্বাগত জানাল পর্তুগীজ সরকার। ১৯৩৬ সালে স্বাক্ষরিত এক চুক্তির বলে নাৎসী সরকার ৯৯ বছরের জন্যে অ্যাংগোলার প্রাকৃতিক সম্পদ সন্ধান ও আহরণের অধিকার পেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় অ্যাংগোলায় জার্মান পুঁজির অনুপ্রবেশ রুদ্ধ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে অ্যাংগোলার সমাজজীবনে বেশ কিছুটা পবিবর্তনের সূচনা হয়। বিভিন্ন বাগিচা, খনি, কারখানা, বন্দর প্রভৃতিতে বহু আফ্রিকান শ্রমিকের কাজ গ্রহণ করে। এইভাবে উদ্ভূত হয় আফ্রিকান শ্রমিকশ্রেণী। নতুন সভ্যতার বাহকরূপে অ্যাংগোলায় শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয় দূরপ্রসারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে আনে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীও গড়ে ওঠে সংখ্যায় অল্প ও শক্তিতে দুর্বল হলেও এই শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। এখানে মনে রাখার দরকার যে, নানা কারণে অ্যাংগোলার অধিবাসীদের মধ্যে আফ্রিকার যা অন্যান্য পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলের তুলনায় 'ইয়োরোপীয় বা পর্তুগীজ সভ্যতা' কিছুটা বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর প্রমান পাওয়া যায় তথাকথিত 'সভ্য' আফ্রিকানদের সংখ্যায়। মোজাম্বিকে যেখানে ১৯৪০ সালের মধ্যে মাত্র ১৮ শত আফ্রিকান (মোট জনসংখ্যার ০·০৩ শতাংশ) 'সভ্য তালিকাভুক্ত হয়ে পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীদের 'অঙ্গীভূত' হয় সেখানে অ্যাংগোলায় ২৪ হাজার আফ্রিকান (জনসংখ্যার ০·৬ শতাংশ) 'সভ্য' তালিকাভুক্ত হয়েছিল। এর বিষময় ফল অনুভূত হয় মুক্তিসংগ্রামের মধ্যেও।

যাই হোক, অ্যাংগোলাতেই শেষপর্যন্ত মুক্তি-আন্দোলন তীব্র ও ব্যাপক হয়ে ওঠে এবং এর সূচনা হয় শ্রমিক বিক্ষোভে। ১৯২৪ সালে অ্যাংগোলার পোর্ট আমবেইনে এবং ১৯২৫ সালে আমব্রিজে বাগিচা-শ্রমিকদেব অভ্যুত্থান পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীদের বুকে কাঁপন ধরায়। ১৯৩০ সালে অ্যাংগোলার পশ্চিমাঞ্চলে মুক্তি আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। লুয়াণ্ডার ডক শ্রমিকরা বিদ্রোহ করেন এবং এই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যে। পর্তুগাল থেকে ফৌজ এনে রক্তস্রোতে নিভিয়ে দেওয়া হয় এই বিদ্রোহের দাবানলকে। তবু আবার বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৯৩৯ সালে অ্যাংগোলাব মুকুবা উপজাতির মধ্যে। এই সময় কৃষকদের মধ্যেও অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং মাঝে মাঝে ছোটখাট অভ্যুত্থানও ঘটে। ফ্যাসিস্ট ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হয় এদের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্তুগাল নিরপেক্ষ থেকে প্রচুর মুনাফা লোটে এবং ঘর গুছিয়ে নেয়। উপনিবেশগুলিতে অর্থলগ্নী করে এবং আফ্রিকান অধিবাসীদের নির্মমভাবে শোষণ করে পর্তুগালের ফ্যাসিস্ট সালাজার সরকার বেশ জাঁকিয়ে বসে। মহাযুদ্ধের পর অ্যাংগোলার কফি চাষের প্রসার ঘটে এবং অ্যাংগোলা দুনিয়ার কফির বাজারের বড়ো রকম সরবরাহকারী দেশ বলে গণ্য হয়। হীরা আহরণের কারবারও ফেঁপে ওঠে, বছরে হীরা উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় লক্ষাধিক ক্যারাট। লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ ও তৈল আহরণ শিল্পগুলিরও বিকাশ ঘটে।

এই সময় অ্যাংগোলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি, ডেনমার্ক প্রচুর অর্থ লগ্নী করে। বিদেশী কোম্পানিগুলি মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। কোম্পানিয়া দি দায়ামেনতেস দি আংগোলার মুনাফা ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ১৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৯ সাল থেকে এই কোম্পানি বছরে ১০ কোটি এসকিউডোরও (পর্তুগীজ মুদ্রা) বেশী মুনাফা করতে থাকে। প্রধানত আফ্রিকানদের বেগার খাটিয়েই এই মুনাফা অর্জন করা হয়। ব্রিটিশ সাংবাদিক ও লেখক বেসিল ডেভিড-সনের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫৪ সালে ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার অ্যাংগোলীকে বেগার খাটাতে বাধ্য করা হয়—এই সংখ্যা হলো পয়সা দিয়ে যাদের খাটানো হয় তাদের প্রায় অর্ধেক।

উপনিবেশ শোষণ এবং আফ্রিকানদের দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সালাজার সরকার পর্তুগীজদের উপনিবেশে বসতি করবার জন্যে উৎসাহ দিতে থাকে। অ্যাংগোলায় দ্বিতীয় ছয়সালা উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৯৫৯-১৯৬৪) অনুসারে সালাজার সরকার ৩ কোটি

৮০ লক্ষ ডলার ঢেলে কুনেনে উপত্যকার উন্নয়ন, সেলায় পর্তুগাল থেকে আনা লোক-জনদের বসতির সম্প্রসারণ এবং কুয়ানজা ও বেনগুয়েলা জেলায় নবাগতদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। আফ্রিকান চাষীদের জমি কেড়ে নিয়ে পর্তুগীজদের দেওয়া হয়। ১৯৬৮ সালে অ্যাংগোলায় ইয়োরোপীয়দের হাতে ছিল ১৫ লক্ষাধিক হেক্টর আবাদী জমি (সবই উৎকৃষ্ট ও উর্বর জমি), আর যে আফ্রিকানরা সংখ্যায় শ্বেতাঙ্গদের চাইতে কুড়ি গুণ বেশী তাদের হাতে ছিল প্রায় ২০ লক্ষ হেক্টর জমি (অনেকাংশ নিকৃষ্ট ও অনুর্বর)। এর উপর "মরার উপর খাঁড়ার ঘা"—অ্যাংগোলীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কোনো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার আছে বলে সালাজার সরকার কখনও মনে করেনি। অনশনে-অর্ধাশনে ও রোগ-ব্যাধিতে হাজার হাজার মানুষ মরে, শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ মানুষ সব বিষয়েই অজ্ঞ থেকে যায়। আর এক সুযোগ গ্রহণ করে উপজাতিতে উপজাতিতে দ্বন্দ্বসংঘর্ষ বাধিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে ভেদনীতি অনুসরণ করে পর্তুগীজ শাসকরা তাদের শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থাকে জোরদার করে।

কিন্তু এত করেও কিছু হলোনা। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে মানুষ জাগল। নিজেদের প্রয়োজনেই পর্তুগীজ শাসকরা তাদের মৃত্যুবান নিজেরাই তৈরি করেছিল। বাগিচা, খনি, ডক, বন্দর ও রেলপথে কর্মে নিযুক্ত হাজার কালো মানুষ নতুন জগতের সন্ধান পেল, নিজেদের ঐক্যের শক্তিকে উপলব্ধি করল। আর এরই সঙ্গে যুক্ত হলো স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত আফ্রিকান যাঁদের চোখ খুলে গিয়েছিল সভ্য দুনিয়ার সংস্পর্শে এসে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূচনা

উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা হলো আধা-বৈধ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত সমিতিগুলির মাধ্যমে। শহরের বুদ্ধিজীবীদের চেষ্টায় "আসুন আমরা অ্যাংগোলাকে আবিষ্কার করি", নব অ্যাংগোলী কবি আন্দোলন, অ্যাংগোলার সাংস্কৃতিক সমিতি প্রভৃতি গড়ে ওঠে। এইসব সমিতি আফ্রিকানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হয়। এর ফলে জাতীয় সংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থান ঘটে এবং স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা জাগে। গ্রামাঞ্চলে গুপ্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিও উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করে। গুপ্ত ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল তোকোইবাদ। খ্রীষ্টীয় ধর্মমত ও চিরাচরিত আফ্রিকান ধর্মগুলির সংমিশ্রণে সিমাও তোকো এই ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে

কঠোর নিয়মশৃংখলা ছিল। অ্যাংগোলা থেকে ইয়োরোপীয় আক্রমণকারীদের বিতাড়ন করাই ছিল এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ।

মুক্তি আন্দোলনের প্রথম স্তরে দীর্ঘকাল সম্প্রদায়গুলিই অ্যাংগোলায় পর্তুগীজ শাসনবিরোধী গণসংগঠনরূপে আন্দোলন চালায়। অনগ্রসর দেশের পক্ষে এটা একান্তই স্বাভাবিক। ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশেও অনুরূপ সংগঠন ছিল। অনগ্রসর চিন্তাধারা, নানাবিধ ধর্মীয় সংস্কার ইত্যাদি সত্ত্বেও কৃষক জনসাধারণের মধ্যে পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে চেতনা জাগানো ও সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে এইসব ধর্মীয় সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

বর্তমান শতাব্দীর ৫০-এর দশকে সারা আফ্রিকায় স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুন ছড়িয়ে পড়লে অ্যাংগোলার মুক্তি আন্দোলন নতুন স্তরে উন্নীত হয়। এই সময় অ্যাংগোলার প্রথম জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি গড়ে ওঠে। ১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকে লুয়াণ্ডায় বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের একটি গোষ্ঠী "অ্যাংগোলা আফ্রিকানদের যুক্ত সংগ্রাম দল" নামে এক দল প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য গুপ্ত রাজনৈতিক সংস্থার সঙ্গে মিলে এই দল অ্যাংগোলা গণমুক্তি আন্দোলন (এম পি এল এ) নামে এক সংগঠন গড়ে তোলেন।

প্রথমে এই সংগঠনের বেশীরভাগ সদস্যই ছিলেন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবী। ব্যাপক প্রচারের ফলে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। শহরের শ্রমিক, কর্মচারী, ব্যবসায়ীরা সংগঠনে যোগ দেন। ৫০-এর দশকের শেষদিকে ক্ষেত-মজুর, বাগিচা-শ্রমিক, কৃষকদের মধ্যেও সংগঠনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমেই এই সংগঠন যুক্ত জাতীয় ফ্রন্টে পরিণত হয়। ৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে সংগঠন বা পার্টির সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ হাজারেরও বেশী। বিপ্লবী গণতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি অগস্তিনহো নেতো দলের নেতা হন।

১৯৬ সালে গণমুক্তি আন্দোলন দলের কর্মসূচী ও নিয়মাবলী রচিত হয়। কর্মসূচীতে অবিলম্বে অ্যাংগোলার স্বাধীনতা ঘোষণা, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সমস্ত নাগরিকের সাম্য, স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং ৮ ঘণ্টা কাজের দিন প্রবর্তনের দাবি জানানো হয়।

১৯৫৪ সালে অ্যাংগোলা পিপলস্ ইউনিয়ন নামে আর একটি জাতীয়তাবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ভিত্তি ছিল দুটি উপজাতি। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে মূলধন করে গড়ে-ওঠা এই দলটির কোনো পরিষ্কার কর্মসূচী ছিলনা। গণমুক্তি আন্দোলন (এম পি এল এ) দল বার-বার একটি ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে পিপলস্ ইউনিয়ন

(ইউ পি এ)-এর সঙ্গে যুক্ত-ফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু ইউ পি এ কখনও তাতে কর্ণপাত করেনি।

৫০-এর দশকের শেষে আর একটি দল স্থাপিত হয় এ্যালায়েন্স অব বোজোমেয়ো পিপল্‌স্ নামে। এটি পরে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব অ্যাংগোলা বা গণতান্ত্রিক দল বলে পরিচিত হয়। ১৯৬২ সালে এই দল ইউ পি এ র সঙ্গে একত্রে লিওপোল্ডভিল (কিনসাসা)-এ জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট নামে সংস্থা খাড়া করে অ্যাংগোলার বিপ্লবী সরকার (নির্বাসনে) গঠন করে। গণমুক্তি আন্দোলন দলকে (এম পি এল এ) ডাকাই হয়নি। এইভাবে জাতীয় মুক্তিআন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করে উল্লিখিত দুটি দল। এদের মধ্যে "সভ্য" অ্যাংগোলীদের অনেকে আছেন যাঁদের ভূমিকা ছিল সন্দেহজনক।

যাই হোক, আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করে ও আন্দোলনের গতিকে রোধ করা যায়নি। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের নৃশংসতা ও অমানুষিকতা আন্দোলনকে আরও প্রবল করে তোলে। অ্যাংগোলার জাতীয় সংস্থাগুলি পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপস-আলোচনা করতে চেয়েছিল। জবাবে ১৯৫৯ সালে শত শত অ্যাংগোলী দেশপ্রেমিক-কে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৭ জন ইয়োরোপীয় সহ ৫৭ জনের বিরুদ্ধে "নাশকতামূলক কার্যকলাপে"র অভিযোগে মামলা আনা হয়।

এঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ অগাস্তিন্‌হো নেতো। ডাক্তারী পাশ করে লুয়ানডায় প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন ডাঃ নেতো। সাহেবদের বিদ্যে শিখে এসে নেতো রোগ সারাচ্ছে, মানুষ বাঁচাচ্ছে নেতোর দেশবাসীরা এই কথা ভেবে গর্ববোধ করতো। খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন তিনি দেখতে দেখতে। আর বুদ্ধিজীবী মহলে তখনই তার বেশ নাম ডাক হয়েছে। কবি, চিকিৎসক দেশপ্রেমিক—একাধারে এমন একটি মানুষ তো সহজে মেলেনা! পর্তুগীজ সরকারের কাছেও তিনি সুপরিচিত, তাঁর রাজনৈতিক মতামত তাদের জানা আছে। ইতিমধ্যে লিসবনে তাকে দুই দুইবার কারারুদ্ধ করা হয়েছে। তাই ১৯৫৯ সালে ধরপাকড় আরম্ভ হলে ডাঃ নেতোও রেহাই পেলেন না। ১৯৬০ সালে লুয়ানডায় তাঁর ডাক্তারখানাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো।

চারদিন চার রাত্রি তাঁকে ঘুমোতে না দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হলো। তারপর পাঠিয়ে দেওয়া হলো কেপ ভারদে দ্বীপে।

ডাঃ নেতোর গ্রেপ্তার আলোড়ন তুলল লুয়ানডায়, তাঁর জন্মস্থান রেংগো ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে। গ্রামবাসীরা দলে দলে পতেতে জেলার সদর দপ্তরে হাজির হলো। লুয়ানডা থেকে ৬০ মাইল দূরে তেতে জেলার সদর দপ্তরে পর্তুগীজ জেলা শাসকের চোখ কপালে উঠলো। কালবিলম্ব না করে তিনি লুয়ানডায় আরও সৈন্য

পাঠানোর জন্যে আবেদন জানালেন। কর্তৃপক্ষ আবেদনে সাড়া দিয়ে জেলার সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দিলেন সাবমেশিন গান সজ্জিত দুই লক্ষ সৈন্য।

সাধারণ মানুষ ভয়ানক কিছু ঘটবে বলে তখনও ভাবেনি। ডাঃ নেতোর গ্রেপ্তারের এক সপ্তাহ পরে নারী ও শিশু সহ প্রায় এক হাজার গ্রামের মানুষের শান্তি-পূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল জেলার সদর দপ্তরে পৌঁছুলে বীরদর্পে পর্তুগীজ সৈন্যরা মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ করলো। নিহত হলো ৩০ জন, আহতদের সংখ্যা দাঁড়াল দুই শত। এতেও গ্রামের মানুষদের স্পর্দ্ধার যথেষ্ট জবাব দেওয়া হলোনা ভেবে সৈন্যরা ডাঃ নেতোর জন্মস্থলে রেংগো ও তার পাশের গ্রাম ইকোলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যাকে পেল তাকেই খুন করলো নির্বিচারে, তারপর আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দিল গ্রাম দুটিকে।

—যে আগুন পর্তুগীজরা জ্বালালো—সে আগুন আর নিভলনা।

পর্তুগীজ ফ্যাসিস্টদের সন্ত্রাসের জবাব দিলেন অ্যাংগোলী দেশপ্রেমিকরা অস্ত্রধারণ করে। ১৯৬১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি গণমুক্তি আন্দোলন দলের (এম পি এল এ) মুক্তিসেনারা আক্রমণ করলেন লুয়ানডার জেলখানা, পুলিসের সদরদফতর ও বেতার-কেন্দ্র। ১০ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয়বার আক্রমণ চালানো হলো। পর্তুগীজরা আক্রমণ প্রতিহত করল, কিছু সংখ্যক মুক্তিসেনা নিহত হলেন অথবা বন্দী হলেন। কিন্তু মুক্তি যোদ্ধাদের এই অসমসাহসিক আক্রমণ সারা অ্যাংগোলায় এক নতুন দিনের ইঙ্গিত বহন করে আনল।

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা উত্তরাঞ্চলে চলে যেতে পেরেছিলেন তাঁদের চেষ্টায় বাগিচা-শ্রমিকরা সংগঠিতভাবে বিদ্রোহ করে। প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলি যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল সেই ধর্মঘটই সশস্ত্র বিদ্রোহের আকার ধারণ করে মার্চ মাসে। বিদ্রোহী শ্রমিকরা কফি বাগিচার মালিক ও পুলিসদের আক্রমণ করে বহু লোককে হত্যা করে, ৫ শত কফি বাগিচার মধ্যে ২০০ বাগিচা ধ্বংস করে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে দেয়। এই বিদ্রোহে ইউ পি এ-ও যোগ দিতে বাধ্য হয়। সালাজার সরকার বিদ্রোহ দমনের জন্যে হাজার হাজার সৈন্য আমদানি করে। ১৯৬২ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত অর্ধলক্ষাধিক অ্যাংগোলীকে হত্যা করা হয় এবং নাপাম বোমা বর্ষণ করে ধ্বংস করা ৬০টিরও বেশী গ্রাম উৎসাদন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে শুধু কংগোতেই আশ্রয় গ্রহণ করে দুই লক্ষাধিক অ্যাংগোলী। ন্যাটো বা উত্তর অতলান্তিক জোটের শক্তিবর্গ পর্তুগালকে সব রকমে সাহায্য করে। ব্রিটেন যুদ্ধজাহাজ ও অস্ত্রশস্ত্র যোগায়, পশ্চিম জার্মানি দেয় অতি আধুনিক সাব-মেশিনগান, মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র যোগান দেয় নাপাম বোমার। পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছ থেকে পর্তুগাল ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে পায় হাজার কোটি এস্কুইডো।

এই সময় থেকেই উগ্র জাতীয়তাবাদীদের খেল শুরু হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট পিপ্‌ল্‌স ইউনিয়ন (ইউ পি আই) দল যুক্ত কম্যান্ড্‌ গঠন করতে অস্বীকার করে এবং শুধু তাই নয়, গণমুক্তি আন্দোলনের পরিচালিত মুক্তিযোদ্ধাদের উপর সশস্ত্র আক্রমণও চালায়। মুক্তি আন্দোলনে নিজেদের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপনেব উদ্দেশ্যে এই দলটি জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

১৯৬৩ সালের গ্রীষ্মকালে কঙ্গোর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আডুলা হোলডেন রবার্টোর (ইউ পি আই-এর নেতা) নেতৃত্বে গঠিত অ্যাংগোলার "বিপ্লবী সরকার"কে স্বীকৃতি দেন। আরও কয়েকটি আফ্রিকান তাঁর পদাংক অনুসরণ করে। সঙ্গে সঙ্গে গণমুক্তি আন্দোলন (এম পি এল এ) দলের বহু সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়, অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং এই দলকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। এম পি এল এ দল তাঁদের সদরদপ্তর কংগোয় (কাঁজাভিল) স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পেরেছিল যে অ্যাংগোলার মুক্তি সংগ্রামকে স্তব্ধ করা যাবেনা। তাই আগে থেকেই কিছুসংখ্যক দালাল যোগাড় করে তাদের সাহায্যে মুক্তিসংগ্রামীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং শেষপর্যন্ত তথাকথিত স্বাধীন অ্যাংগোলায় একটি নতুন সরকার স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে।

এব ফল যা দাঁড়ায় তা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এখন যেসব দেশদ্রোহী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাদের পরিচয় জানা যাক।

মার্কিন গোয়েন্দারা দুইজন দালালকে বেছে নেয়। একজন হলো জোস গিলমোর বনাম হোলডেন রবার্টো আর একজন জোনাস মালহেইরো সাভিমাব।

জোস গিলমোরের উৎকট উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। সে অ্যাংগোলায় জন্মগ্রহণ করলেও তার শৈশবকালেই তার বাপ-মা কংগোর (লিওপোল্ডভিল) বাসিন্দা হয়ে যান। বড় হয়ে গিলমোর কংগো রাজ্যের রাজা হওয়ার সাধ হয়। তার চক্রান্তেই বা কংগো উপজাতির নেতা ও কংগোরাজ তৃতীয় আন্তনিওকে বিষ খাইয়ে মারা হয়। রাজা হওয়ার সাধ তার মিটলো না, কিন্তু আকাঙ্খা অনেক। ভাগ্যান্বেসী এই জোস গিলমোরকে হাত করে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ মুক্তিফ্রণ্টে বিভেদ সৃষ্টির জন্যে উঠেপড়ে লেগে যায়। জোস গিলমোরের নতুন নামকরণ হয় হোলডেন রবার্টো।

হোলডেন রবার্টোর কাহিনী গোয়েন্দা কাহিনীর চাইতেও চমকপ্রদ, তবে সে

কাহিনী এখানে বিস্তারিতভাবে বলার প্রয়োজন নেই।

প্রচুর অর্থ ঢেলে এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে হোলডেন রবার্টোকে দিয়ে কংগোর (বর্তমান জাইরে), একটি অস্থায়ী বিপ্লবী অ্যাংগোলান সরকার পর্যন্ত গঠন করা হয়।

কংগোর (লিওপোলড্‌ভিল) তখন প্রায় পাঁচ লক্ষ অ্যাংগোলান বাস করত, কাজেই কিছু লোক যোগাড় করা হোলডেন রবার্টোর পক্ষে খুব কঠিন হয়নি। এর উপর কংগো সরকারের সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য তাকে আরও উৎসাহিত করে। এই দেশদ্রোহীর চক্রান্তের বলি হয় হাজার হাজার অ্যাংগোলান, পর্তুগীজরাও বাদ পড়েনি।

মুক্তিসংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠলে আর একটি উপজাতীয় সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে হোলডেন রবার্টো ১৯৬২ সালের ২৭ মার্চ এফ এন এল এ (ন্যাশনাল ফ্রন্ট ফরাদ লিবারেশন অব অ্যাংগোলা বা অ্যাংগোলার মুক্তির জন্যে জাতীয় মোরচা) গঠন করে। কিন্তু যখন জোস গিলমোর বনাম হোলডেন রবার্টো প্রথমে ইউ পি এন এ (ইউনিয়ন অব পপুলেশনস্‌ অব নর্থ অ্যাংগোলা বা উত্তর অ্যাংগোলার জাতিসমূহের ইউনিয়ন) এবং পরে ইউ পি এ (ইউনিয়ন অব পপুলেশনস্‌ অব আফ্রিকা) গঠন করে তখনই তার অনেক ব্যাপার ফাঁস হয়ে যায়।

এর উপর জোনাস মাল হেইরো সাভিমবি নামে আর একজন ভাগ্যান্বেষী দেশদ্রোহীর আবির্ভাব ঘটায় ব্যাপার আরো জটিল হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদীরা তো কোনো একজন দেশদ্রোহীর উপর নির্ভর করে থাকতে পারেনা। কাজেই সাভিমবির অর্থের অভাব হলোনা এবং ন্যাশনাল ইউনিয়ন ফরদ টোটাল ইনডিপেনডেন্স অব অ্যাংগোলা (উনিতা) বা অ্যাংগোলার পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে জাতীয় ইউনিয়ন নামে আর একটি সংস্থা গজিয়ে উঠল।

প্রথম দিকে হোলডেন রবার্টো ও সাভিমবি ধোঁকা দিয়ে কিছুটা আস্থা অর্জন করলেও তাদের আসল রূপ ধরা পড়তে বেশি দেরী হলনা। দুই ভাগ্যান্বেষী দেশদ্রোহীর মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষেই স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হলো। সাভিমবি ও আরও অনেকে ১৯৬৪ সালেই তথাকথিত 'বিপ্লবী (মূলে ছিল প্রজাতন্ত্রী) অ্যাংগোলা সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। শুধু তাই না, সাভিমবিই প্রকাশ্যে হোলডেন রবার্টোকে সি আই এ-র চর বলে ঘোষণা করে সব কিছু ফাঁস করে দেয়। এরপরেই তার নিজস্ব সংগঠন তৈরি করে সাভিমবি যে সাম্রাজ্যবাদের বেশি নির্ভরযোগ্য দালাল তা প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। হোলডেন রবার্টো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এবং সাভিমবি পর্তুগালের গোয়েন্দা বিভাগের চররূপে কাজ করতে থাকে।

পর্তুগালে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর এই দুই আততায়ী দলের সম্পর্কে প্রচুর দলিলপত্র পাওয়া গেছে।

জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সত্ত্বেও অ্যাংগোলার মুক্তিসংগ্রামের অগ্রগতিকে রোধ করা গেলনা। গণমুক্তি আন্দোলন দল নিজেদের পুনর্গঠিত ও সংহত করে নবোদ্যমে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইউ পি এ-র স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা (ও এ ইউ) ইউ পি এ-র নেতৃত্বে পরিচালিত তথাকথিত অ্যাংগোলা সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সাল থেকে গণমুক্তি আন্দোলন দল আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার কাছ থেকে বৈষয়িক সাহায্য পেতে থাকে। এই সময় ইউ পি এ-তে ভাঙন ধরে এবং বহু বিশিষ্ট সদস্য নেতাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে ইউ পি এ-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯৬৬ সাল থেকে ইউ পি এ অ্যাংগোলায় সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়, মুক্তি আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করাই তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

গণমুক্তি আন্দোলন দল (এম পি এল এ) ইতিমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করে নতুনভাবে তাদের মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করে। গেরিলা যুদ্ধের কৌশল আয়ত্ত করে মুক্তিসেনারা উপনিবেশবাদীদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালে দুই হাজার অভিযান চালিয়ে মুক্তিফৌজ ১৬ শতাধিক পর্তুগীজ সৈন্যকে বধ করে ও বহু অস্ত্রশস্ত্র দখল করে। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের জয়যাত্রা শুরু হয়। অ্যাংগোলার এক-তৃতীয়াংশের বেশি জায়গা শত্রু কবলমুক্ত হয়। চার লক্ষাধিক বর্গকিলোমিটারের অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় মুক্তিফৌজের পূর্ণ কর্তৃত্ব। মুক্তাঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। যুদ্ধ চলতে থাকে অ্যাংগোলার ছয়টি অঞ্চলের মধ্যে পাঁচটি অঞ্চলে। মুক্তিফৌজের অগ্রগতি রোধের জন্যে পর্তুগীজ সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকার সাহায্যে অতি আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত ৮০ হাজার সৈন্য সমাবেশ করে।

অ্যাংগোলার মুক্তিফৌজকে বিরাট বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান তাদের পক্ষে একটা বড়ো রকমের বাধা দাঁড়ায়। তানজানিয়া, জামবিয়া প্রভৃতি আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির সাহায্যে তারা এই বাধা অতিক্রমের চেষ্টা করে। কিন্তু দার-এস-সালাম বন্দর থেকে জিনিসপত্র আনতে হলে কম-সেকম দু হাজার কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যখন লড়াই চলছিল তখন এইসব অঞ্চলে মুক্তিফৌজের রসদ ও সমরসম্ভার পাঠাতে আরো ৭ শত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হতো। পিঠে মাল নিয়ে ভারবাহীরা

এই পথ অতিক্রম করত পারে হেঁটে গভীর অরণ্য, জলাভূমি ও কাশবনের মধ্যে দিয়ে।

এইসব বাধা অতিক্রম করে মুক্তিফৌজ দুর্বার আক্রমণ চালিয়ে যায়, আঘাতের পর আঘাত হানে উপনিবেশবাদীদের উপর। দিশাহারা পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ১৯৭২ সালের বসন্তকাল থেকে ব্যাপক আকারে গাছপালা ও উদ্ভিদ-ধ্বংসী বিষবাষ্প প্রয়োগ করতে থাকে। মার্কিন আগ্রাসীদের অনুকরণে পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীরাও অ্যাংগোলায় দ্বিতীয় ভিয়েতনাম সৃষ্টির চেষ্টা করে। পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী কায়েতানো সদম্ভে ঘোষণা করেন যে, পর্তুগাল 'শুধু একটি সভ্যতাকেই' রক্ষা করছে না, ব্যাপকতম সভ্যতা বলতে যা বোঝায় সেই সভ্যতাকে' রক্ষা করছে।

সাম্রাজ্যবাদী ও জাতিবর্ণদ্বেষী ফ্যাসিস্ট ও আধা-ফ্যাসিস্ট সরকারগুলির সমর্থনপুষ্ট পর্তুগীজ সরকারের 'সভ্যতা' রক্ষার অভিযানের বিরুদ্ধে অ্যাংগোলীরা গড়ে তোলে দুর্জয় প্রতিরোধ। গত ১৩ ডিসেম্বর অ্যাংগোলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট নামে পরিচিত আর একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গণমুক্তি আন্দোলন (এম পি এল এ) দলের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তি অনেক বেড়ে যায়। উভয় ফ্রন্ট বা দল ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এটা অন্যান্য মিত্র আফ্রিকান রাষ্ট্রের অভিপ্রেত ছিল। পর্তুগীজ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অ্যাংগোলী মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থন জানায় সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এবং সমস্ত দেশের প্রগতিশীল মানুষ। সাহায্য পাঠায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ।

অ্যাংগোলার গণমুক্তি আন্দোলন দলের (এম পি এল এ) নেতা ও সভাপতি অগস্তিনহো নেতো সগৌরবে ঘোষণা করেন : "পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীরা পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করছে, তাদের শাসনের অবসান ঘটতে আর দেরি নেই।"

তিনি বলেছেন : "উপনিবেশবাদ ও জাতিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সর্বদাই সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনবাদী পররাষ্ট্রনীতির একটি দৃঢ় নীতি। ব্যবহারিক জীবনে এই নীতি প্রকাশ পেয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আমাদের আন্দোলনকে নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থনদানের মধ্যে এবং আফ্রিকার স্বাধীনতার জন্যে যারা লড়ছে তাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতির মধ্যে।"

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ অ্যাংগোলার মুক্তিকামী জনগণের পাশে এসে দাঁড়ানোর ফলে মুক্তিফৌজের মনোবল ও অস্ত্রবল বেড়ে যায়। বিচলিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ পর্তুগালের ফ্যাসিস্ত সালাজারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে থাকে।

আফ্রিকার পরিস্থিতির উল্লেখ করে ন্যাটো বা উত্তর আতলান্তিক যুদ্ধ জোটের

সেক্রেটারি জেনারেল ডির্ক স্টিকার ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডনে ঘোষণা করেন : "কমিউনিস্ট বিপদের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে।"

এই সময় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি ও ফ্রান্স যুক্তহস্তে পর্তুগালকে অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র এবং সর্বপ্রকার সমরসম্ভার যোগাতে থাকে। এর ফলে অ্যাংগোলা, মোজাম্বিক ও অন্যান্য অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী দুনিয়ার সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সম্মুখীন হতে হয়। পরে মাওবাদী চীনও সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মেলায়।

১৪

"আমাদের সশস্ত্রবাহিনী স্নায়বিক মনস্তাত্ত্বিক অবসাদের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছে।

—জেনারেল কোস্তা গোমেজ,
পর্তুগীজ সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়ক, ১১ মে, ১৯৭৫

লড়াই, লড়াই আর লড়াই—বছরের পর বছর। পথে-প্রান্তরে, গভীর অরণ্যে, নদীবক্ষে, শহরে গ্রামে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। অজস্র আধুনিক সমরাস্ত্র, প্রচুর সমরসম্ভার, যুদ্ধজাহাজ, ট্যাংক, বিমান—সবকিছুর সাহায্য নিয়েও পর্তুগীজ বাহিনী পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধাদের হঠাতে পারল না। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে, বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে, দানবীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়ে, নারী শিশু নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষকে খাঁচায়-পোরা পশুর মতো কাঁটাতারে ঘেরা অঞ্চলগুলিতে আটক রেখে দমানো গেলনা মুক্তিকামী আফ্রিকার কালো কালো মানুষগুলিকে। তারা আসতেই থাকে—কখনো অশরীরি ছায়ার মতো অরণ্যের আড়ালে আড়ালে, কখনো ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রোধোন্মত্ত সিংহের মতো একেবারে সামনে এসে, কখনো আকস্মিক ঘূর্ণীঝড়ের মতো সব তছনছ করে দিয়ে যায়।

ক্লান্ত, পর্তুগীজ সৈন্যরা, তাদের সেনাপতিরা বড়ো ক্লান্ত, বড়ো অসহায়। এমন অবস্থা বেশিদিন চলতে পারেনা। তাই একদিন তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি করে জ্বলতে থাকা বিক্ষোভ দাবানলের মতো লেলিহান শিখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়ল। দাবানলের সূচনা হলো অদ্ভুতভাবে। জেনারেল আনতোনিও দে স্পিনোলা

ছিলেন পর্তুগালের ফ্যাসিস্ত সরকারের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন লোক। তাঁর বাবা সালাজার সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের ইন্সপেক্টর-জেনারেল ছিলেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে অশ্বারোহীবাহিনীতে যোগ দিয়ে স্পিনোলা লেফটেনাণ্ট পদ লাভ করেন এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় জেনারেল ফ্রাংকোর পক্ষে লড়েন। এরপর ১৯৬১ সালে অ্যাংগোলায় মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হন।

১৯৬৮ সালে গিনি-বিসাউ-এর শাসনকর্তা ও প্রধান সেনাপতি উভয় পদে নিযুক্ত হয়ে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত স্পিনোলা গিনি-বিসাউতে শাসনকার্য চালান এবং মুক্তি-ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই সময়কার তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর মানসিক বিপর্যয় ঘটায় এবং তিনি যুদ্ধবিরোধী ও ফ্যাসিস্ত শাসনবিরোধী হয়ে ওঠেন। লিসবনে ফিরে গিয়ে তিনি সেনানীমণ্ডলীর সহকারী অধিনায়ক নিযুক্ত হন, কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত অসন্তোষ ও বিক্ষোভ তিনি চেপে রাখতে পারলেন না। এখানে বলা যায় যে, গিনি-বিসাউতে মুক্তিযোদ্ধাদের দৃঢ়সংকল্প অসাধারণ শৌর্যবীর্য ও রণনৈপুণ্য এবং পর্তুগীজবাহিনীর নৈরাশ্য ও অসন্তোষ স্পিনোলার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধের বন্যাকে রোখা যাবেনা। তাই তিনি "পর্তুগাল ও তার ভবিষ্যৎ" নামে এক বই লিখে প্রকাশ করলেন। এই বইতে তৎকালীন গেমাস-কায়েতনো সরকারের পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকা সংক্রান্ত কর্মনীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। স্পিনোলার বই সারা দেশে এবং বাইরেও বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে। এর ফলে স্পিনোলা পদচ্যুত হন। কিন্তু বিক্ষোভের আগুন তখন জ্বলে উঠেছে। মনস্তত্ত্ববিদদের ভাষা অনুসরণ করে পর্তুগীজ সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়ক জেনারেল কোস্তা গোমেজ বললেন : আমাদের সশস্ত্রবাহিনী স্নায়বিক—মনস্তাত্ত্বিক অবসাদের শেষ সীমায় পৌঁছিয়েছে।"

এই ক্লান্তি, এই অবসাদই পর্তুগীজ বাহিনীকে যুদ্ধ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য করল এর অর্থ পরাজয় স্বীকার, কিন্তু তা স্বীকার করতেও তাদের বাধা নেই, বরং উপনিবেশবাদ বজায় রেখে যারা দেশের দুঃখদুর্দশার ও তার পরাজয়ের গ্লানির জন্যে দায়ী তাদের ক্ষমতাচ্যুত করাই তাদের কর্তব্য। এই কর্তব্যবোধ জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৭৪ সালের ২৫ এপ্রিল পর্তুগীজ অফিসারদের আকস্মিক সশস্ত্র অভ্যুত্থান দীর্ঘ ৪৮ বছরের ফ্যাসিস্ত শাসনের অবসান ঘটালো।

ফ্যাসিস্ত শাসনই পর্তুগালের উপনিবেশবাদকে গায়ের জোরে টিঁকিয়ে রেখেছিল। তার সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিলনা। ফলে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা, পরে মার্কিন, ফরাসি

পুঁজিপতিরাই পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি থেকে দুহাতে মুনাফা লুঠছিল। পর্তুগীজ ধনপতিরাও এই লুঠের কিছু বখরা পেতেন, কিন্তু জনসাধারণকে বহন করতে হতো উপনিবেশ বহাল রাখার বিপুল বোঝা। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ এই বোঝাকে আরো গুরুভার করে তুলেছিল। উপনিবেশবাদের বিলাসিতা তারা আর সহ্য করতে রাজী ছিলনা। ফ্যাসিস্ত শাসনের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে প্রচণ্ড দমননীতি সত্ত্বেও। এই দমননীতির শিকার হয়েছেন কমিউনিস্ট থেকে আরম্ভ করে ফ্যাসিস্তবিরোধী সকল শ্রেণীর মানুষ। পর্তুগীজ বাহিনীর প্রগতিশীল অফিসারদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানাল পর্তুগালের জনগণ। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ-বাদের শেষ একটা প্রকাণ্ড ঘাঁটি চূর্ণ হয়ে গেল।

পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন যুগের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অক্টোবর মহাবিপ্লবের দ্বারা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহৎ আদর্শের দ্বারা। সমস্ত মানুষকে সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্ত করার মহৎ লক্ষ্য সামনে রেখেই তাঁরা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আর কার্যক্ষেত্রে সেই লক্ষ্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেই তাঁরা নিপীড়িত, নিগৃহীত ও শোষিত সমস্ত মানুষের আস্থাভাজন হয়েছিলেন। অর্ধোলঙ্গ, নিরক্ষর, নিরন্ন লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিল মুক্তিসংগ্রামে। তারা বুঝেছিল মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যের উপরেই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সাধারণ মানুষ, তাই কোনো কিছুর পরোয়া না করে মুক্তিসংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। অকথ্য নির্যাতন, নির্মম মৃত্যু কিছুই তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। আফ্রিকা-বিশেষজ্ঞ বেসিল ডেভিডসন আফ্রিকার জনগণের এই সংগ্রামকে "রাজনৈতিক সংগ্রাম" আখ্যা দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক সাফল্যের মূলে আছে তাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের সাফল্য।

আর এই সাফল্য শুধু পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার জনগণকে মুক্ত করেনি, মুক্ত করেছে পর্তুগীজ জনগণকেও। ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল।

১৯৭৪ সালের জুলাই মাসের শেষদিকে পর্তুগীজ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি জেনারেল আনতোনিও দি স্পিনোলা আফ্রিকায় পর্তুগালের উপনিবেশগুলি সম্পর্কে প্রজা-তান্ত্রিক পর্তুগালের মূলনীতি নির্ধারণ করে একটি সাংবিধানিক আইন স্বাক্ষর করলেন। পর্তুগালের ১৯৩৩ সালের যে ধারা অনুসারে আফ্রিকার উপনিবেশ-গুলিকে পর্তুগীজ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সেই ধারাটি বাতিল করা হলো।

এরপর অগস্ট মাসের গোড়ার দিকে পর্তুগালের অস্থায়ী সরকার (আর্মড ফোরসেস মুভমেন্ট বা সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলনের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত) এবং কমিউনিস্ট পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি ও পিপল্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতিনিধিরা এক বিবৃতি প্রকাশ করে—গিনি-বিসাউ প্রজাতন্ত্রকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করার, অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে একটি চুক্তি করার এবং জাতিসংঘের সনদ অনুসারে গিনি-বিসাউ-এর জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার আবেদন সমর্থন করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন। পর্তুগালের অস্থায়ী সরকার এরই সঙ্গে সঙ্গে অ্যাংগোলা, মোজাম্বিক, কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জ এবং সাওতোম ও প্রিন্‌চেপের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের ও স্বাধীনতা লাভের অধিকার স্বীকার করে নিলেন।

২৫ এপ্রিলের সশস্ত্র অভ্যুত্থান যাঁরা ঘটিয়েছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলন (এম এফ এ) নামক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত তাদের গিনি-বিসাউ শাখা ১৯৭৪ সালের ২৯ জুলাই বিসাউ-এ অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে এক স্মরণীয় বিবৃতি দেন।

এই বিবৃতিতে বলা হয়: "উপনিবেশের জনগণ ও পর্তুগালের জনগণ পরস্পরের মিত্র।" এই ঘোষণার অর্থ পরিষ্কার-এর অর্থ পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার জনগণের হাতে তাদের দেশগুলি তুলে দিয়ে তাদের স্বাধীনভাবে দেশশাসন ও উন্নয়নের পরিপূর্ণ অধিকার স্বীকার করা।

"সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলনের" সিদ্ধান্ত অনুসারে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ভাস্‌কো দোস সানতোস গোনসাল্‌ভ্‌স লিসবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন যে, উপনিবেশগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকানদের হাতে যেসব নীতি অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে সেগুলি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

এইভাবে দীর্ঘ ১৩ বৎসরব্যাপী রক্তক্ষরী ঔপনিবেশিক সংগ্রামের অবসান আসন্ন হলো, উন্মুক্ত হলো এতদিনের পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার মানুষ ও পর্তুগালের মানুষের সামনে এক নতুন দিগন্ত।

তবু উগ্র দক্ষিণপন্থীরা এই অবস্থাকে মেনে নিতে পারল না। তাদের বিভিন্ন দল ও উপদলগুলি ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখার উদ্দেশ্যে চক্রান্তে লিপ্ত হলো। একটি ঘটনা তাদের উৎসাহিত করল।

পর্তুগীজ দক্ষিণপন্থী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের উৎসাহিত হওয়ার কারণ মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদপন্থীদের আবির্ভাব। মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন মজবুত হলেও নানা ধরনের মানুষ সংগঠনের মধ্যে স্থান পাওয়ায় অনেক বিষয়ে মতভেদ দেখা দিত।

এই মতভেদ একসময় গুরুতর আকার ধারণ করল। ১৯৭৩ সালে যখন সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠেছে সেই সময় গণ-মুক্তিবাহিনীর সহসভাপতি এবং অন্যতম বিশিষ্ট মুক্তি-যোদ্ধা ড্যানিয়েল 'চিপেন্ডা তাঁর সমর্থকদের নিয়ে সংগঠন থেকে বেরিয়ে গেলেন। সংকীর্ণ উপজাতি কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিপেন্ডা প্রথমে সংগঠন দখলের চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে জাম্বিয়ার একটি প্রভাবশালী মহল তাঁকে উৎসাহ দেয়।

এম পি এল এ বা অ্যাংগোলার গণ-মুক্তিবাহিনী চিপেন্ডার হঠকারী কার্য-কলাপ ব্যর্থ করে দিতে পারলেও চিপেন্ডা ও তাঁর দলবল সরে যাওয়ায় বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ঠিক এই সময় সাম্রাজ্যবাদী ও পর্তুগীজ দক্ষিণপন্থীরা দেশদ্রোহী হোলডেন রবার্টো এবং জোনাস সাভিমবিকেও কাজে লাগায়।

সাভিমবির 'উনিতা' বাহিনী যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে এই খবর ফলাও করে পর্তুগীজ কাগজগুলিতে ছাপা হয়। উদ্দেশ্য—দেশদ্রোহীদের সঙ্গে আপস-আলোচনা চালিয়ে অ্যাংগোলায় একটি পুতুল সরকার গঠন করা। এ ব্যাপারে জাইরের মোবুতু সরকারও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। তৈলসম্পদসমৃদ্ধ কাবিন্দা গ্রাস করাই ছিল মোবুতুর লক্ষ্য।

সাভিমবি খাস পর্তুগীজ সরকারের লোক, কাজেই সাভিমবিকেই পর্তুগীজ কাগজ-গুলিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ সময় পর্তুগালে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন জেনারেল আন্তোনিও দি স্পিনোলা। স্পিনোলা মুক্তিবাহিনীগুলির সঙ্গে আপস করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি তখনও মার্কিন সৈন্যবাহিনীর সাহায্য লাভের স্বপ্ন দেখছেন। তাঁর সমালোচনাই ফ্যাসিস্তশাসনের ভিত টলিয়ে দিলেও তিনি নতুন কায়দায় আফ্রিকায় পর্তুগীজ আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন।

জেনারেল স্পিনোলা পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যুগপৎ মোবুতু, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সাম্রাজ্যবাদী মুরুব্বীদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা চালাতে থাকেন। অ্যাংগোলাতেও পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীদের নানা সংগঠন গজিয়ে ওঠে। এইরকম কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে স্পিনোলার প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়।

ইতিমধ্যে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে এবং স্পিনোলাকে পদত্যাগ করতে হয়। কিন্তু তাঁর চক্রান্ত তখন বেশ পেকে উঠেছে।

এই চক্রান্তের নিট ফল দাঁড়ায় এই যে, এম পি এল এ-র সঙ্গে হোলডেন রবার্টো ও সাভিমবির সৈন্যদলগুলিও রাজধানী লুয়াণ্ডায় থাকতে পারবে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এর মারাত্মক পরিণতি ঘটে। তিনটি দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত অস্থায়ী সরকার থেকে এম পি এল এ-কে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে গণমুক্তি বাহিনী ও তার সমর্থকদের উপর আক্রমণ শুরু হয়। পর্তুগীজ ফ্যাসিস্তরাও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়।

হোলডেন রবার্টো লুয়াণ্ডায় একটি পত্রিকা (আ প্রোভিন্সিয়া দি অ্যাংগোলা) কিনে নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসে ড্যানিয়েল চিপেনডাকে হাত করে ক্ষমতা দখলের জন্যে প্রস্তুত হলো।

এদিকে চিপেনডা তখন পুরোপুরি একটি দস্যুদলের নেতা হয়ে উঠেছে। ব্যাঙ্ক লুঠ, শহরে শহরে বিত্তশালীদের বাড়ি ঘুরে হানা দিয়ে লুঠতরাজ তার দলের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কিছুকাল পরে যখন দেশদ্রোহীরা পিছু হটতে আরম্ভ করল তখন জানা গেল যে, চিপেনডা—হোলডেন রবার্টো কর্তৃক "মহাযোদ্ধা" ও "মহান দেশপ্রেমিক" রূপে বর্ণিত চিপেনডা—তাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে সরে পড়েছে।

অ্যাংগোলার নবজাগ্রত জনগণের পূর্ণ সমর্থনে মুক্তিবাহিনী সাম্রাজ্যবাদী সমস্ত চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ ও তাদের দোসর দক্ষিণ আফ্রিকা ও চীনের সাহায্যপুষ্ট হোলডেন রবার্টো ও সাভিম্বির গুণ্ডাবাহিনী পিছনে রেখে গেল ধ্বংস ও তাণ্ডবের ভয়ঙ্কর চিত্রগুলি, রেখে গেল শত শত সাধারণ মানুষ ও মুক্তি-যোদ্ধাদের শব। তাদের বীভৎস অত্যাচারই সেদিন সাধারণ মানুষকে চিনিয়ে দিয়েছিল কে শত্রু আর কে মিত্র।

১৯৭৫ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাস অ্যাংগোলার ইতিহাসে এক চরম সংকটের এবং অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অ্যাংগোলার এক গৌরবময় বিজয়লাভের কালরূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই সময় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ, মাওবাদী চীনের বিপুল পরিমাণ আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত দেশদ্রোহী বাহিনী অ্যাংগোলার তথাকথিত কোয়ালিশন সরকারের (রবার্টো-সাভিম্বি জোট) পক্ষ থেকে এম পি এল এ-র বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার হাজার হাজার সৈন্য অ্যাংগোলা আক্রমণ করে। বিদেশ থেকে ভাড়া করা ঘাতক-বাহিনীও আমদানি করা হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলোনা, অ্যাংগোলার মুক্তিবাহিনী সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করল।

১৫

"আমরা বার বার বলেছি এবং আবারও বলছি যে, আফ্রিকার উত্তরে বা দক্ষিণে অথবা অন্য কোনো অংশে আমাদের কোনো বিশেষ স্বার্থ নেই ও থাকতে পারেনা এবং সেখানে আমরা কোনো সুযোগ সুবিধাও চাচ্ছিনা। প্রত্যেক জাতির তার নিজের ভবিতব্য নির্ধারণ করার, তার বিকাশের নিজস্ব পথ বেছে নেওয়ার পবিত্র অধিকার স্বীকার করা হোক এই আমরা চাই। এটা আমাদের অপরিবর্তনীয় নীতি যা থেকে আমাদের পার্টি ও সোভিয়েত জনগণ কখনও বিচ্যুত হবেনা"।

—অ্যাংগোলার রাষ্ট্রপতি নেতোর সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত ভোজসভায় লিওনিদ ব্রেজনেভের ভাষণ।

"কৃষ্ণ আফ্রিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশী স্বার্থ রয়েছে অ্যাংগোলায়।"

—মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরী কিসিংগার, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬

(পরে কিসিংগার একেবারে উল্টো কথা বলেন)

প্রঃ একথা বলাও কি সঠিক হবে যে, অ্যাংগোলায় সামরিক কাযকলাপ চালানোর জন্যে আপনি কিসিংগারের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়েছিলেন।

উঃ আপনি নিজে থেকেই যদি একথা বলেন তাহলে আপনাকে আমি মিথ্যাবাদী বলব না।

—দঃ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ও "নিউজউইক" পত্রিকার রিপোর্টারের সাক্ষাৎকার : ১৭ মে, ১৯৭৬

সমস্ত জাতির মুক্তিসংগ্রামে সুস্পষ্ট সমর্থন জানানো এবং সর্বপ্রকার সাহায্য দান সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অন্যতম মূলনীতি। আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য পালনের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ এই নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে অবিচলভাবে অনুসরণ করে এসেছে ও করছে। আফ্রিকা মহাদেশের আরব ও কৃষ্ণাঙ্গ জাতিগুলির মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

একথা বললে অতিরঞ্জন করা হবেনা যে, স্বাধীনতা ও অগ্রগতির জন্যে আফ্রিকার জাতিগুলির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যের অনেকটাই অর্জিত হয়েছে সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত কর্মনীতির ফলে। মুক্তিসংগ্রামের সূচনাকালে আফ্রিকার অনেক দেশের দেশপ্রেমীরা অক্টোবর মহাবিপ্লব এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েত দেশপ্রেমিকদের অকুণ্ঠ আত্মত্যাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মুক্তিসংগ্রামরত সমস্ত জাতির প্রতি সোভিয়েতের অকুণ্ঠ সমর্থন তাঁদের উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করেছিল।

১৯৭৪ সালের ২২ নভেম্বর জামবিয়ার রাষ্ট্রপতি কেনেথ কাউনডা বলেছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময়েই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রেরণাস্বরূপ ছিল এবং এখনও তাই আছে।

আফ্রিকা ঐক্যসংস্থার সহকারী সাধারণ সম্পাদক পিটার ওনু লিখেছেন যে, সোভিয়েত কর্মনীতি মুক্তিসংগ্রামের স্বার্থানুগ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনের জন্যে আফ্রিকান জাতিগুলি সত্যসত্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কৃতজ্ঞ।

এদিকে উপনিবেশবাদ পিছু হটতে থাকলেও তার টিঁকে থাকার জন্যে মরিয়া চেষ্টার বিরাম নেই। কখনও হুমকি দিয়ে, কখনও আগ্রাসী কর্মনীতি অনুসরণ করে, কখনও 'বিভীষণ বাহিনী' সৃষ্টি করে এবং নাশকতা চালিয়ে, কখনও একেবারে ভালমানুষ সেজে নানা কূটকৌশলের মাধ্যমে কাজ হাসিল করার চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদীরা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মরণদশা যার ঘনিয়ে এসেছে তাকে কে বাঁচাবে? তাই ৭০-এর দশকে এক "অঘটন" ঘটে গেল। পর্তুগীজ সৈন্যবাহিনীই রুখে দাঁড়াল যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে। পর্তুগালে ফ্যাসিস্ত সরকারের পতন হলো এবং তারই সঙ্গে উপনিবেশগুলির মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তাঁদের নিজ নিজ দেশের শাসনভার তুলে দিয়ে তাঁদের দেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করতে রাজী হয়ে গেলেন পর্তুগালের নতুন নেতারা। সাম্রাজ্যবাদীদের গালে মাছি চলে গেল। এমন ব্যাপার যে 'ঘটতে পারে তা' তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। দশ বছরেরও

অধিককাল তারা অকাতরে অর্থ ঢেলেছে, অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি ডলার লগ্নী করেছে অ্যাংগোলায়, মোজাম্বিকে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, রোডেশিয়ায়। এখন অর্থ ঢালা ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ বৃথা হলো, লগ্নী ও দখলকরা বিপুল তৈল, খনিজ সম্পদ প্রভৃতিও হাতছাড়া হতে চলেছে।

এরপরই শুরু হলো সাম্রাজ্যবাদীদের নতুন খেলা। খেলার প্রস্তুতি অনেক আগে থাকতেই চলেছিল, এবার তা প্রত্যক্ষ করা গেল। সব দেশেই দলাদলি থাকে এবং দলাদলির মূলে শ্রেণীগত ও গোষ্ঠীগত বিরোধ থেকে আরম্ভ করে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি অনেক কিছু থাকে। মুক্তিসংগ্রামের সময় আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এমন দলাদলি দেখা গেছে এবং তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি। গিনি-বিসাউ এবং মোজাম্বিকে এই দলাদলির সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা যাদের হাত করতে চেয়েছিল তাদের দিয়ে বিশেষ কিছু করা গেলনা এবং কিছুকালের মধ্যেই তারা বিলুপ্ত হয়ে গেল। গিনি-বিসাউ ও কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং সাওতোম ও প্রিন্‌চেপের মতো ক্ষুদ্র দুটি দ্বীপও ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আবির্ভূত হলো। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করল অ্যাংগোলায়। অ্যাংগোলা এক বিশাল দেশ, সম্পদও সেখানে অজস্র, বিদেশী লগ্নীর পরিমাণও কম নয়। এ অবস্থায় অ্যাংগোলাকে হাতে রাখার জন্যে সাম্রাজ্যবাদ আগে থেকেই প্রস্তুত হবে এ তো স্বাভাবিক। দুটি বিভীষণ বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শেষ করে সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চিন্ত ছিল। অ্যাংগোলার মুক্তি-বাহিনীকে (এম পি এল এ) ঘায়েল করার জন্যে যা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার সবই সাম্রাজ্যবাদীরা করেছিল।

অ্যাংগোলায় প্রগতিশীল দেশপ্রেমিকরা এম পি এল এ-র পতাকাতলে সমবেত হলে অ্যাংগোলার দুটি বিভেদপন্থী দল সক্রিয় হয়ে উঠলো।

এফ এন এল এ দলের নেতা হলেন হোলডেন রবার্টো। গোড়া থেকেই সি আই এ-র দালাল। অ্যাংগোলার মুক্তিসংগ্রামকে বানচাল করে দেওয়ার দায়িত্ব ইনি গ্রহণ করেছিলেন। এখানে ওখানে হানা দিয়ে এবং নিজের সংগঠনের কথা খুব ফলাও করে প্রচার করে আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহানুভূতি লাভ করতেও ইনি সক্ষম হন। হোলডেন রবার্টোর কেরামতিতে খুসী হয়ে সি আই এ তার পারিশ্রমিক দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে বছরে দশহাজার ডলার ধার্য করল। হোলডেন রবার্টো তার সদর দপ্তর স্থাপন করেছিল জাইরের (কংগো কিনসাসা—এই কংগোতেই আফ্রিকার অন্যতম খ্যাতনামা নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা প্যাট্রিস লুমুম্বাকে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের

জল্লাদদের সাহায্যে নির্মমভাবে হত্যা করে) রাজধানী কিনসাসাতে। এখানে বসে নিরাপদে সে অ্যাংগোলার ভিতরের খবর যোগাড় করত, নাশকতা চালাত, এম পি এল এ-র নেতা ও কর্মীদের হত্যা করত। মার্কিন প্রভুদের ইঙ্গিতে এখানেই ১৯৬২ সালে অ্যাংগোলার নির্বাসিত বিপ্লবী সরকার (জি আর এ ই—রিভোলিউ-শনারি গভর্ণমেণ্ট অব অ্যাংগোলা ইন একজাইল) স্থাপন করে এবং নিজেই এই তথাকথিত সরকারের প্রধান হয়।

ক্রমে এই তথাকথিত "বিপ্লবী সরকার" ও হোলডেন রবার্টোর আসল রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র এই সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে এবং আফ্রিকার ঐক্য সংস্থা (ও এ ইউ) এই সরকারকে স্বীকার করতে গররাজী হয়ে এক বিবৃতি দেয়।

কিন্তু অ্যাংগোলার পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠতে থাকায় রবার্টোর তৎপরতা বাড়তে থাকে। ১৯৭৫ সালের ১১ নভেম্বর অ্যাংগোলায় স্বাধীনতা ঘোষণা করা সম্পর্কে পর্তুগালে জানুয়ারি মাসে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুধাবন করে কি করতে হবে না হবে সে সম্বন্ধে সুপারিশ করা ও পরিকল্পনা রচনার জন্যে গঠিত হয় ৪০ জনের কমিটি মার্কিন সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর জানুয়ারি মাসেই এই কমিটির এক বৈঠকে অ্যাংগোলার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।

এই বৈঠকের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয় প্রায় এক বছর পরে ১৯৭৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর "নিউইয়র্ক টাইমস"-এ। সেমুর এম, হার্শ-এর প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, ৪০-এর কমিটি সি আই এ কর্তৃক রবার্টোকে গোপনে তিন লক্ষ ডলার দেওয়ার প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। হার্শ তাঁর প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে ওয়াশিংটনের একজন পদস্থ রাজকর্মচারীর উক্তি উদ্ধৃত করেন। উক্ত রাজকর্মচারী বলেন, "আমি মনে করি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই টাকাটা তাকে আরো বেশী মদত দেবে (রবার্টোকে)। লোকটা প্রায় দশ বছর কিনসাসায় বসে আছে, এখন হঠাৎ সে যথেষ্ট খোরাক পেয়ে গেল—লোকটা কাজ করতে শুরু করেছে।"

১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে লনডনের "টাইমস্" পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। "টাইমস্"-এর ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা প্যাট্রিক বোরগ্যান-এর এই রিপোর্টে বলা হয়:

"ওয়াশিংটনের সূত্রগুলি থেকে এখন বলা হচ্ছে যে, সি আই এ ১৯৭৫ সালের

জানুয়ারী মাসে প্রথমে সিদ্ধান্ত করে যে, অ্যাংগোলী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কমিউনিস্ট বিরোধীদের সাহায্য করার জন্যে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সি আই এ-র তত্ত্বাবধায়ক ৪০-এর কমিটি এর পর এফ এল এন এ-কে (রবার্টোর সংগঠন লেঃ) তিন লক্ষ ডলার পাঠানো অনুমোদন করে।" এইসব ঘটনার পর ৪০-এর কমিটি ও জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের ঘন ঘন বৈঠক বসতে থাকে। ওদিকে অ্যাংগোলায় রবার্টোর আততায়ীদের চোরা-গোপ্তা আক্রমণ ও নাশকতা সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে।

বিপদ ঘনিয়ে উঠছে বুঝে মুক্তিফৌজ রাজধানী-লুয়াণ্ডার জনগণের সক্রিয় সহ-যোগিতায় রবার্টোর আততায়ী দল ও "উনিতা"র দলবলকে লুয়াণ্ডা থেকে বিতাড়িত করে। এই সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বিচলিত হয়ে ওঠে এবং 'বিভীষণ'-বাহিনীগুলিকে আরও সাহায্য দিয়ে পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে আনার আনার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। সি আই এ হোলডেন রবার্টো এবং 'উনিতা'কে সামরিক সাহায্যদানের জন্যে ৬০ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করার একটি কর্মসূচী তৈরি করে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ফোর্ড এই কর্মসূচী সংশোধন করে জুলাই মাসে ৬০ লক্ষের জায়গায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করেন। মদত পেয়ে হোলডেন রবার্টো প্রকাশ্যেই মুক্তি ফৌজের (এম পি এল এ) বিরুদ্ধে "সর্বব্যাপী যুদ্ধ" ঘোষণা করে। এই সময় থেকে পেন্টাগন বা মার্কিন সমরদপ্তর সর্বাধিক সমরোপকরণ 'বিভীষণ' বাহিনীগুলিকে সরবরাহ করতে থাকে। ডলারের অঙ্কে তার হিসাব কখনো জানতে পারা যাবেনা।

অ্যাংগোলার গণমুক্তিফৌজের অগ্রগতি 'বিভীষণ' বাহিনী রুখতে পারছে না দেখে পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬ অগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকা অ্যাংগোলা আক্রমণ করে। এই পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয় ব্রিটেনের "অবজার্ভার" পত্রিকা। এই পত্রিকার ১১ জানুয়ারির সংখ্যায় প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায় যে, অ্যাংগোলার যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ সম্পর্কে একটি নামকরা আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্যে একটি গোপন রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। গোপন রিপোর্টের সারমর্ম হলো এই যে, "অ্যাংগোলার যুদ্ধে একটি ব্রত পালনের জন্যে "ইণ্ডিপেনডেন্স" নামক একটি বিমানবাহী জাহাজ, ক্ষেপণাস্ত্র সমন্বিত ক্রুইজার এবং তিনটি পাহাবাদার ডেস্ট্রয়ার নিয়ে গঠিত একটি মার্কিন হানাদার নৌবহর ১৯৭৫ সালের ১৫ ও ২৩ নভেম্বরের মধ্যে তৈরি থাকার হুকুম পেয়েছে। বিমানবাহী জাহাজ "ইণ্ডিপেনডেন্স"-এ ছিল ৯০টি এফ-এ ফ্যানটম জেট বিমান। এ ছাড়া এই জাহাজে কয়েক শত টন নাপাম বোমা, সাইড উইণ্ডার ক্ষেপণাস্ত্র এবং এ্যান্টি-পারসোনেল বোমা বোঝাই করা হয়।

শেষপর্যন্ত নির্দিষ্ট দিনে এই নৌবহরকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কারণ পেন্টাগণ দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক আসন্ন আক্রমণের কথা জেনে নিশ্চিত হয়েছিল। মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের ধারণা হয়েছিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকা বাহিনী গণ-মুক্তিফৌজকে পর্যুদস্ত করে লুয়াণ্ডায় পৌঁছে যাবে কাজেই পেন্টাগণ তাড়াহুড়ো করে হানাদার নৌবহর না পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ইতিমধ্যে বিভীষণ বাহিনীগুলিকে সাহায্যদানের পরিমাণ ১০০ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে মার্কিন সরকার রাজী হয়ে গেলেন। ২৩ অগস্ট সিয়েরা লিওনের সরকারি মুখপত্র "নেশন" লিখলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এফ এন এল এ ও উনিতাকে ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি, লরী যোগাবে। এসব পাঠানো হবে দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মতিক্রমে নামিবিয়া দিয়ে এবং মার্কিন তৈল সংস্থা গাল্ফ অয়েলের সাজ-সরঞ্জামের ছদ্মাবরণে কাবিন্দার মধ্যে দিয়ে।

এইসব অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ যে পাঠানো হয়েছিল তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল যখন মুক্তিফৌজ বিভীষণ বাহিনীগুলিকে হটিয়ে দিয়ে প্রচুর সমরোপকরণ দখল করল। একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশী ও স্থানীয় সাংবাদিকদের এইসব সমর-সম্ভারের নমুনা দেখানো হয় নভেম্বর মাসে অ্যাংগোলার রাজধানী লুয়াণ্ডায়। শুধু বিভীষণ বাহিনীগুলিকে মদত দিয়ে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার উপর ভরসা রেখে পেন্টাগণ বা সি আই এ বসে থাকেনি। প্রচুর অর্থব্যয় করে ভাড়াটে সৈন্য আমদানিরও ব্যবস্থা হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের নানা খুনী ও গুণ্ডারা। যুদ্ধ জয়ের পর স্বাধীন ও সার্বভৌম অ্যাংগোলা সরকার গঠিত বিচারকমণ্ডলীর এজলাসে এদের অনেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে।

যাই হোক এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত সেবক দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে নজর দেওয়া যাক। ১৯৭৫ সালের ১১ই নভেম্বর অ্যাংগোলার স্বাধীনতা ঘোষিত হবে বলে স্থির হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সাহায্য পেতে থাকলেও পর্তুগীজ শাসন বজায় থাকা পর্যন্ত তার পরিমাণ খুব বেশী হতে পারেনি। প্রধানত গেরিলা রণকৌশল অনুসরণ করে পর্যুদস্ত ও বিচ্ছিন্ন পর্তুগীজ সৈন্যদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সমরোপককরণ কেড়ে নিয়েই মুক্তি যোদ্ধাদের যুদ্ধ চালাতে হয়েছে। অ্যাংগোলার স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজদের শাসনের অবসান ঘটবে ও মিত্র দেশগুলির কাছ থেকে আসবে বিপুল পরিমাণ সাহায্য। এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলি ১১ নভেম্বরের আগেই মুক্তি-যোদ্ধাদের খতম করে লুয়াণ্ডা দখল করতে চেয়েছিল। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত

তাড়াটে সৈন্যদলসহ বিভীষণ বাহিনীগুলির আক্রমণ ও নাশকতা রোধের জন্যে অ্যাংগোলার গণ-মুক্তিফৌজ যখন প্রাণপণে লড়ছে তখন দক্ষিণ আফ্রিকার দিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে উঠল। এই বিপদের দিনে অ্যাংগোলার মুক্তিকামী মানুষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন কিউবার স্বেচ্ছাসৈন্যরা। সম্মিলিত বাহিনীর কাছে প্রচণ্ড মার খেয়ে পলায়ন করল দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিবৈরী বাহিনী। কিউবার স্বেচ্ছা-সৈন্যদের অ্যাংগোলায় উপস্থিতি নিয়ে খুব হৈ হল্লা হয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদী পত্র-পত্রিকায় "সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ", "নতুন মহাযুদ্ধের আশঙ্কা", "কিউবার স্পর্ধা" প্রভৃতি চমকপ্রদ শিরোনামায় অনেক চাঞ্চল্যকর কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ পর্তুগীজ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বৈধ অ্যাংগোলা সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটো বা উত্তর আতলান্তিক যুদ্ধজোট এবং চীনের চক্রান্ত সম্পর্কে এই সব পত্রপত্রিকা সম্পূর্ণ নীরব ছিল। শুধু তাই নয়, ১১ নভেম্বর (১৯৭৫) অ্যাংগোলার স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার পরও সমানে অ্যাংগোলার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত চলতে থাকে।

সেদিন রাষ্ট্রপতি ফোর্ড অ্যাংগোলার বিভীষণ বাহিনীগুলিকে সাহায্যদানের কৈফিয়ৎস্বরূপ বলেছিলেন যে, স্থানীয় অধিবাসীদের (অ্যাংগোলার—লে) অধিকাংশ যখন শুধু আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্রশস্ত্র চাইছে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেমন করে তাদের সে আবেদন অগ্রাহ্য করবে। তিনি বলেছিলেন যে অ্যাংগোলায় মার্কিন ফৌজ পাঠাবার কোনো কথাই ওঠেনা, প্রশ্ন শুধু "সামান্য সাহায্য" দেওয়া নিয়ে।

এ সম্বন্ধে একটি ফরাসি পত্রিকার মন্তব্য তুলে দিলেই যথেষ্ট হবে। "লে মঁদ ডিপ্লোমাতিক" পত্রিকা বলেছিলেন:

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অ্যাংগোলা তথা আফ্রিকার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলকে তার জমিদারী বলে মনে করে।"

ডিসেম্বর মাসের যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে—উক্ত পত্রিকা বলেন:

"বর্তমানে অ্যাংগোলীদের অকিঞ্চিৎকর সংখ্যালঘু অংশ এম পি এল এ-র বিরুদ্ধে লড়ছে। এর (এম পি এল এ—লে) শত্রুরা হলো প্রধানত জাইরেরী, দক্ষিণ আফ্রিকান এবং প্রাক্তন পর্তুগীজ বাসিন্দা এবং অ্যাংগোলা ও মোজাম্বিকের পর্তুগীজ সৈন্যরা। প্রকৃতপক্ষে হোলডেন রবার্টো ও জোনাস সাভিম্বি সব ক্ষমতা হারিয়েছে ··"

অ্যাংগোলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের কথা সারা দুনিয়া জানলেও মার্কিন সরকারি মহল দীর্ঘকাল এই হস্তক্ষেপের কথা অস্বীকার করে এসেছেন। অবশেষে মুক্তিফৌজ বিভীষণ বাহিনীর ঘাঁটির পর ঘাঁটি দখল করতে

[illegible] অস্ত্রশস্ত্র এই হৃৎকম্পের 'কাহিনী' প্রকাশ করতে শুরু করলেন মার্কিন [illegible]।

১৯৭৫ সালের ১২ই ডিসেম্বরের "ওয়াশিংটন স্টার" পত্রিকায় বলা হল: "গত তিন মাসে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সি আই এ সে) প্রধানত জাইরের মাধ্যমে ২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার বণ্টন করেছে এবং শীঘ্রই আরও ২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার বণ্টন করার পরিকল্পনা করেছে।" ঐ পত্রিকা বলেন, "যারা পর্তুগীজ হিসাবে থাকতে চায় সরকার শুধু সেইসব পর্তুগীজ অধিবাসীর নিরাপত্তার জন্যে প্রয়োজনীয় সামরিক পুলিশী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে" বলে প্রধানমন্ত্রী কায়েতানো ১৯৭০ সালে যখন নির্বাচনী ভাষণে পর্তুগালের সামরিক অভিযানের সাফাই গান তখন প্রায় দুই লক্ষ পর্তুগীজ সৈন্য উপনিবেশগুলিতে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।

১৯৬৮ সালেই ১ লক্ষ ৮২ হাজার সৈন্য অর্থাৎ পর্তুগালের অস্ত্রধারণের ক্ষমতা প্রাপ্ত এখন মোট জনসংখ্যার ১০.১ শতাংশকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। পৃথিবীর ছোট বড় দেশগুলিতে যুদ্ধক্ষম মানুষদের শতকরা যত ভাগ সামরিক বাহিনীতে ছিল এই হার সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি। যুদ্ধের ব্যয় বাড়তে বাড়তে ১৯৭২ সালে দাঁড়ায় ১৯২ কোটি ৫১ লক্ষ এসকুদো (পর্তুগীজ মুদ্রা)।

পর্তুগালে বিমান বা অন্য কোনো অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হতোনা অথচ তার কোনো বিমান বা অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অভাব হয়নি। সব যুগিয়েছে ন্যাটো বা উত্তর আতলান্তিক যুদ্ধ জোট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি।

সেনেটর ক্লার্ক পাকাপাকিভাবে জানিয়েছেন, মার্কিন সামরিক সাহায্য বাবদ প্রায় ৫ কোটি ডলার দেওয়া হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস-এর ১৯৭৫ সালের ১৭ ডিসেম্বরের সংখ্যায় বলা হয় "মোট অর্থের পরিমাণ ৬ কোটি ডলার।"

মার্কিন সেনেট ও প্রতিনিধিসভা শেষপর্যন্ত অ্যাংগোলার বিভীষণ বাহিনীগুলিকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দিলেও নানা উপায়ে এই সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

অ্যাংগোলা, মোজাম্বিক, গিনি-বিসাউ ও কেপভারদে দ্বীপপুঞ্জ, সাওতোম ও প্রিন্সিপে—আফ্রিকার সমস্ত পর্তুগীজ উপনিবেশই তাদের মুক্তিসংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছে।

এসব দেশের কোনো স্বার্থ ছিলনা, ছিল শুধু মুক্তিকামী জনগণের পাশে দাঁড়ানোর এবং তাদের জয়যুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কর্মনীতি অনুসরণ করেই তাদের আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য-পালন করেছে। এর মধ্যে 'রাখঢাক' কিছু নেই। সাম্রাজ্যবাদকেই তার সব কাজ করতে হয়েছে।

গোপনে, সুড়ঙ্গ পথ ছাড়া প্রকাশ্য রাজপথে তার আনাগোনার উপায় নেই। তার অন্ধ কমিউনিস্টবিরোধিতাও তাকে জনগণের দুষমণের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য করেছে, ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা আজ সর্বত্র বিচ্ছিন্ন, কোণঠাসা। তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, সকল দেশেই তারা ঘৃণিত।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত জনগণের উদার সাহায্য ও ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতার কথা মনে রেখে অ্যাংগোলার রাষ্ট্রপতি নেতা ক্রেমলিনের ভোজসভায় বলেন:

"আমাদের ইতিহাসের সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলির অ্যাংগোলীরা সোভিয়েত জনগণের জঙ্গী সংহতি সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন ছিল। সোভিয়েত জনগণ অ্যাংগোলার মুক্তির জন্যে যা কিছু দরকার তা যোগানোর জন্যে তাদের বৈষয়িক সহায় সম্পদ দিয়েছেন। ইতিহাস কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত যারা আমাদের দেশে তাদের শাসন স্থায়ী করতে চেয়েছিল সেইসব শক্তিকে পরাভূত করার জন্যে শিল্প ও কৃষিজাত পণ্য পাঠানো হয়েছিল এবং কারিগরি সাহায্য দেওয়া হয়েছিল।"

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সাহায্য মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই পর্তুগালের উপনিবেশগুলিতে এক দূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের কার্যকলাপ এই পরিবর্তনকে আরো ত্বরান্বিত করেছে এবং সদ্যস্বাধীন সমস্ত রাষ্ট্রই সমাজতন্ত্রাভিমুখী হয়েছে। ছোট্ট রাষ্ট্র সাওতোম ও প্রিন্‌চেপের রাষ্ট্রপতি ম্যানুয়েল পিন্টো দা কোস্তার মন্তব্যেই এই অভিমুখিনতা স্পষ্ট করে উঠেছে। তিনি বলেছেন: "আমাদের লক্ষ্য হলো এক ন্যায়ের সমাজ—যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না।" "পুঁজিবাদী পন্থায় বিকাশ লাভের কোনো প্রশ্ন আদপেই ওঠেনা। আমরা এপথ অগ্রাহ্য করেছি, কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত উপনিবেশবাদের সমস্ত ভার বহনের স্বাদ আমরা পেয়েছি।"

পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার মুক্তিযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা সম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের স্বরূপ যেমন সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে তেমনই সমাজতন্ত্রের মহিমময় রূপকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

এই গ্রন্থ রচনায় প্রধানত যেসব গ্রন্থ ও পত্রিকাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলির একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

১) A Short History of Africa—Roland Oliver and J. D. Fage

২) A History of Africa 1918-1967 (Moscow)—Institute of Africa, U. S. S. R. Academy of Sciences.

৩) Africa in Modern History—Basil Davidson.

৪) Black Mother— „ „

৫) The Africans— „ „

৬) Mozambique—John Paul

৭) Secret Weapon in Africa—Oleg Ignatyev

৮) Africa in Soviet Studies—1968 Annual

এ ছাড়া মস্কো থেকে প্রকাশিত International Affairs, New Times, Asia and Africa Today প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি থেকেও প্রচুর সাহায্য পাওয়া গেছে।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	পৃঃ	শুদ্ধ
আমেরিকা ও এশিয়া	২৩	আমেরিকা ও এশিয়ার
সৃষ্টি করেছিল	২৬	সৃষ্টি হয়েছিল
একদল	২৯	একজন
তার জাহাজ	৩১	…জাহাজগুলিতে
তুলে দিল	৩২	তুলে দিত
ইয়োরোপের…অন্তর্নিহিত	৩২	ইয়োরোপের…তাদের দাসব্যবসায়ের অন্তর্নিহিত
সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী	৩৩	…বিরাট
আদি ইয়োরোপীয়দের	৩৭	…ইয়োরোপীয়দের
আফ্রিকার থেকে	৩৯	আফ্রিকার
ইথিওপিয়া ও আবিসিনিয়া	৪৫	ইথিওপিয়া
এবার বলতেও	৪৬	একথা বলতেও
চৌগো	৫৭	টোগো
কটি বৃহৎ	৬১	৮টি বৃহৎ
ফলে ব্রিটেন আফ্রিকাতেও	৬২	ফলে আফ্রিকাতেও
সমগ্র সংগ্রাম, সমগ্র অভ্যুত্থান,	৬৭	সশস্ত্র সংগ্রাম, সশস্ত্র অভ্যুত্থান,
অভ্যুদয়, চাজ, উপনিবেশগুলিতে		অভ্যুত্থান, চাদ উপনিবেশগুলিতে
বিরত হলেন	৬৯	বিরত হলেন না
আফ্রিকার…ঘটালেন	৭০	আফ্রিকার…ঘটালো
অঞ্চলগুলিকে দক্ষিণ পশ্চিম	৭২	অঞ্চলগুলিকে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা,
আফ্রিকা (সাময়িক) এশিয়া ৫'৪৪		(নামিবিয়া) এশিয়ার ৫৪৪
উড়িয়ে দেবার, জন্তে	৭৫	উড়িয়ে দেবার চেষ্টা, পণ্য
আফ্রিকাকে সমাজ	৭৬	আফ্রিকান সমাজ
বিন দাসী	৭৭	কিনসাসা
কংগ্রেস আপসরফার চেষ্টা করলে	৭৮	কংগ্রেস আপসরফার চেষ্টা করে।
সৈন্ততা, পূর্ণ	৭৯	সৈন্সরা, স্বর্ণ

৭৪ পৃঃ "আফ্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশ" থেকে "গ্রহণ করতে থাকেন" পর্যন্ত দুটি প্যারা পুনরাবৃত্তি মাত্র, অতএব বর্জনীয়।

(গুরুতর অশুদ্ধির ক্ষেত্রে শুদ্ধপাঠ উপরে দেওয়া হয়েছে)